নিরীক্ষা

২১৯তম বিশেষ সংখ্যা : আগস্ট ২০১৮

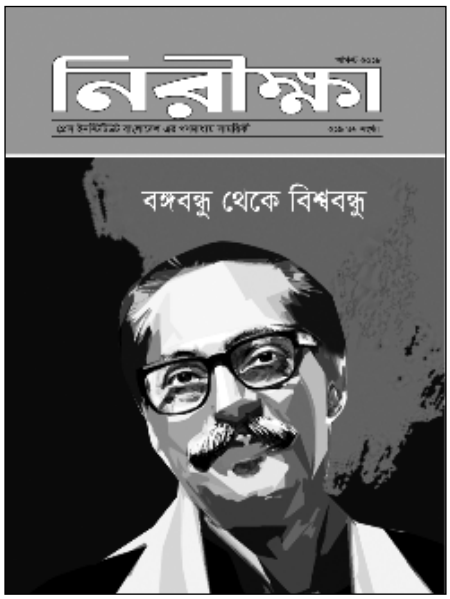

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর শাহাদত বার্ষিকীর মাস আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। ১৫ই আগস্টের বিয়োগান্ত ঘটনা বাঙালির হৃদয়ে অব্যাহত রক্তক্ষরণ ঘটায়। বঙ্গবন্ধু যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি তেমনি তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটিও প্রথম দিয়েছিলেন। পিআইবি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় শোক দিবসকে কেন্দ্র করে নিরীক্ষা'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। এ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম সম্পৃক্ত লেখা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণ এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে। নিরীক্ষা'র এ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা এ মহৎ হৃদয় মানুষটিকে স্মরণ করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছি।

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
বিধান চন্দ্র কর্মকার

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রতিফলন ৫
রীতা ভৌমিক

একটি শোক মিছিলের সংবাদ ৯
মো. মিনহাজ উদ্দীন

বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু ১১
অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন রাষ্ট্র ভাবনা ও বহির্বিশ্ব সম্পর্ক ১৫
শামীমা চৌধুরী

অবিস্মরণীয় দৈনিক পূর্বদেশ এবং বঙ্গবন্ধু ১৮
শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

বঙ্গবন্ধুর কলকাতা স্মৃতি ২১
ড. শিল্পী ভদ্র

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল ২৮
বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু
শ্যামল দত্ত

'বঙ্গবন্ধু অনেক বড়ো মাপের মানুষ' —কামাল লোহানী ৩১
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত ছিলেন না ৩৬
স্বদেশ রায়

৪০ **আমার স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু**
সেলিনা খালেক

৪২ **বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: তথ্য সংকলন**
ড. আবুল কাশেম

৪৮ **১৫ই আগস্ট লন্ডনের ন্যক্কারজনক তাণ্ডব**
এক প্রেস কাউন্সিলরের ভাষ্য
মিনহাজ উদ্দীন

৫০ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**
বাঙালির অবিনাশী আলোকবর্তিকা
ড. মাহাবুবুর রহমান

৫৩ **বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং রক্তে লেখা বঙ্গবন্ধুর সংবিধান**
সুমি খান

৫৮ **সাহসী সহোদরা শেখ হাসিনা শেখ রেহানা**
বোরহান বিশ্বাস

৬১ **চিত্রকলায় বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও বর্তমান ভাবনা**
গৌতম কুমার বিশ্বাস

৬৩ **বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও প্রাসঙ্গিকতা**
বিনয় দত্ত

৬৬ **বঙ্গবন্ধুর শেষ বিকেল**
মো. আবদুল রকিব খান

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৯তম বিশেষ সংখ্যা
আগস্ট ২০১৮

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর এ কথায় প্রমাণিত, বঙ্গবন্ধু ২৩ বছর শুধু বাঙালির স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে লড়াই করেননি, তাঁর মনের কোটরে লুকিয়ে ছিল 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। সেই সঙ্গে সেই দেশটির টিকে থাকার স্বপ্ন।

ক্ষমতায় আসীন হয়ে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার উদ্যোগ নেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৬

১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও তিনি প্রকৃত রাজনীতির পাঠ ও সক্রিয়তা লাভ করেছিলেন এই কলকাতা বাসকালেই। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেলের ছাত্র থাকাকালেই। ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আবাস হয়ে ওঠে এই বেকার হোস্টেল। ... কমবেশি পাঁচ বছর বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। 'বেকার' শব্দটি শুনে কারও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়– এটি বোধহয় কর্মহীনদের হোস্টেল; বস্তুত তা নয়। জনৈক ইংরেজ (BAKER)-র নামে এর নামকরণ

দেখুন- পৃষ্ঠা ২১

লোকে-লোকারণ্য। বাড়িঘরে লোক, গাছে গাছে লোক। রাস্তায় লোক। বঙ্গবন্ধুকে একটা ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ... ফেরার পর তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, দেশের মানুষ যে আত্মত্যাগ করেছে, নির্যাতন সহ্য করেছে– এসবকিছুর জন্য তিনি জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাধুবাদ জানিয়েছেন। অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তিন বছর সময় চাইলেন এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলা এবং তাঁর যে স্বপ্ন-সাধ, দেশকে সোনার বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য *দেখুন- পৃষ্ঠা ৩১*

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে বিদীর্ণ হওয়ার আগেই তিনি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির পথনির্দেশনা তৈরি করে গেছেন। আজ তাঁরই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনকে পাথেয় করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ... বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ, মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫০

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র প্রকাশনা

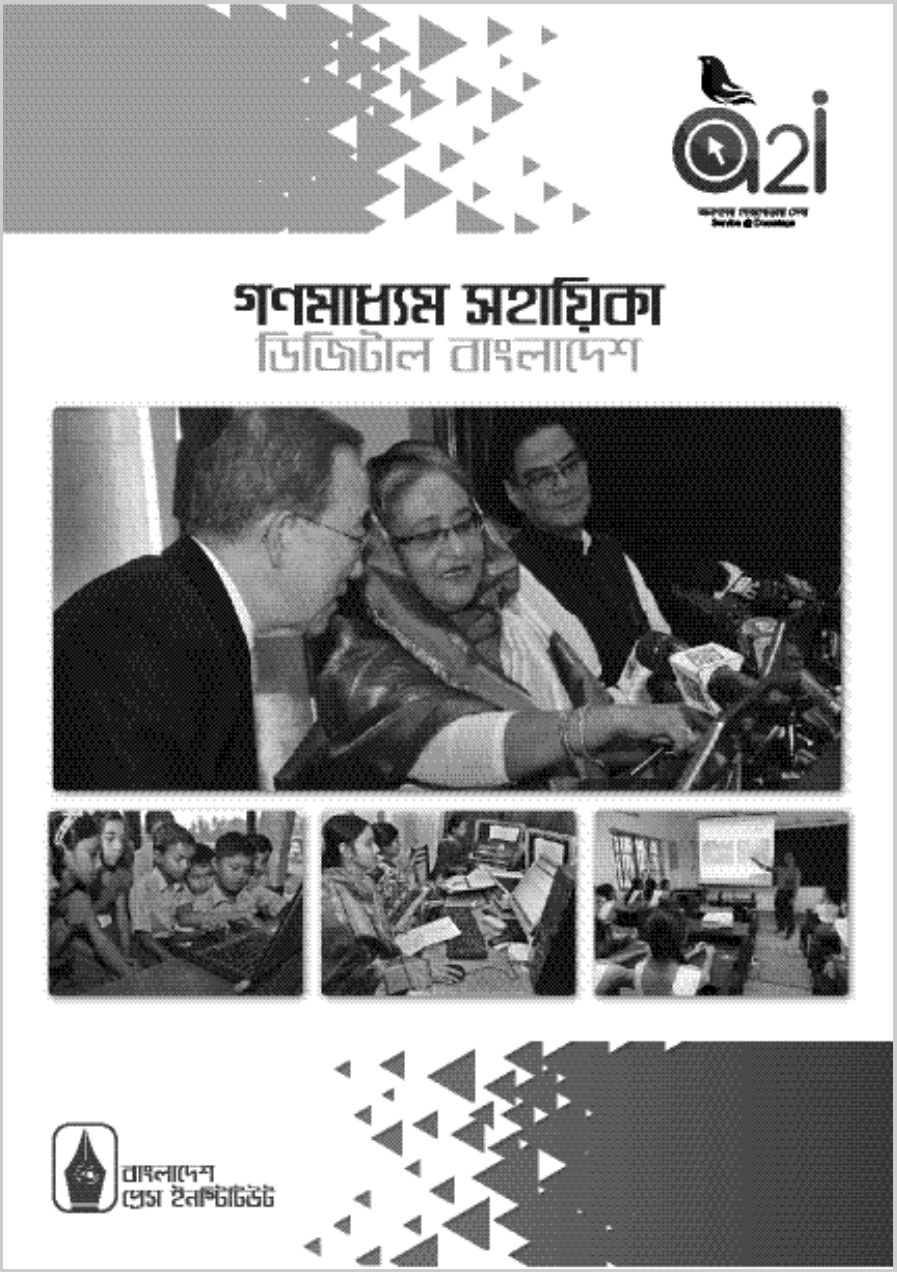

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

৩ সার্কিট হাউস রোড

ঢাকা-১০০০

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রতিফলন

রীতা ভৌমিক

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে এদিন স্বাধীন বাংলাদেশের একটি নক্ষত্রের মৃত্যু হয়েছিল। সেই মৃত্যু ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর, বেদনাদায়ক। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অথচ অসীম সাহসী এই মানুষটি নিহত হওয়ার আগ মুহূর্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। পুরো জীবন লড়াই করেছেন সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে তিনি বাংলার স্বাধীনতা, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। সেই বাংলার মাটিতে পাকিস্তানপন্থি শোষকরাই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ছবির ডান পাশে প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর বাণী প্রকাশিত হয়। বাম পাশে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাণী প্রকাশিত হয়।

এই সংবাদ প্রকাশের আগমুহূর্ত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিকসহ দেশবাসী জানতেন না সকালে যখন এই সংবাদটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে, তখন তাদের জন্য আরেকটি ভয়ংকর সংবাদ অপেক্ষা করছিল।

প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর বাণীতে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন সম্পর্কে সংবাদে বলা হয়:

দৈনিক বাংলা ক্রোড়পত্র
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভাগমন জাতীয় জীবনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আমাদেরকে নতুন করে সচেতন করে তোলে। অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা উভয়ের কথাই মনে জাগে।

এই দেশের মানুষের জাগরণের ইতিহাস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস একটি অখণ্ড ও অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে যেমন সেই জাগরণ প্রচেষ্টায় নিজের অবদানকে যুক্ত করেছে, অন্যদিকে আবার তেমনি জাগরণের প্রতিভূ হিসাবেও কাজ করেছে। উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটানো, দেশের মনীষীদের বিশ্বের জ্ঞান-ঐশ্বর্যের অংশভাগী করা সচেতনতার সাধারণ স্তরকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসব শিক্ষাগত দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছে। যে জাতীয়তাবোধের ক্রমাগত বিকাশে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সেই বোধের এবং জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে সামগ্রিক আদর্শ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত সেই আদর্শের উন্মেষ, লালন ও প্রচারে এই বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়েও উজ্জ্বলতর। যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন, তার জন্য উপযুক্ত কর্মীবাহিনী বেরিয়ে আসবে এর সৃজনগৃহ থেকে এবং সেই কর্মীদের কর্মধারার মধ্য দিয়ে বহুযুগের পুঞ্জীভূত বেদনার অবসান ঘটিয়ে এই দেশে নতুন সূর্যের উদ্ভাসন ঘটবে...।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ওই দিনই ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির নিজ বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এরপরের দিন ১৬ আগস্ট দৈনিক বাংলায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়।

'শেখ মুজিব নিহত: সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি: সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ/ খোন্দকার মুশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি' শিরোনামে বলা হয়:

শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করে। সশস্ত্র বাহিনীর এই ক্ষমতা গ্রহণের সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনে নিহত হন বলে ঘোষণা করা হয়।

বাসস পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়, সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন ঘোষণা ও সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। দুপুরের পর অবশ্য 'মুছল্লীদের' জুম্মার নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে দেড় ঘণ্টার জন্যে সান্ধ্য আইন তুলে নেয়া হয়।

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে ঘরের ভেতরে অবস্থান করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। নয়া সরকারের সাথে দেশের সকল দেশপ্রেমিক ও শান্তি-প্রিয় নাগরিককে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে...।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে যারা খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার সংবাদে তাদেরই পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মুশতাক আহমদের বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ১৬ আগস্ট প্রকাশ হয়। কিন্তু ভাষণে কোথাও তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করেননি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করাই ছিল হত্যাকারীদের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট 'বাংলাদেশ অবজারভার'-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু খবরটি Armed Forces take over: Martial Law proclaimed: curfew imposed Mushtaque becomes President MUJIB KILLED: SITUATION REMAINS CALM শিরোনামে প্রকাশিত হয় এভাবে:

The Armed forces of Bangladesh took over power in the 'greater national interest' under the leadership of the President, Khondker Mushtaque Ahmed toppling the former president Sheikh Mujibur Rahman early Friday morning, says BSS.

The former president Sheikh Mujibur Rahman was killed at his residence during the take - over, it was announced.

Martial Law has been proclaimed and curfew imposed all over the country untill further order.

বাংলাদেশের বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের নিহত হওয়ার সংবাদ, হত্যাকারীদের এবং হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে তেমন কোনো সংবাদই প্রকাশিত হয়নি। অথচ সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব ছাড়াও পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনসহ ২৬ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো ছেলে শেখ কামাল ও বড়ো পুত্রবধূ সুলতানা কামাল, মেজো ছেলে শেখ জামাল ও মেজো পুত্রবধূ পারভীন জামাল রোজী, কনিষ্ঠ ছেলে শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধুর সেজো বোনের স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, সেজো বোনের মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর মেজো বোনের ছেলে শেখ ফজলুল হক মণি ও স্ত্রী বেগম আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ ও আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই আবদুল নঈম খান রিন্টু প্রমুখ।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট ভারতের জাতীয় পত্রিকা আনন্দবাজারে 'পূর্ণ মর্যাদায় মুজিব স্বগ্রামে সমাহিত' নতুন বাংলাদেশ সরকারের নীতি সম্প্রীতি: রাষ্ট্রপতি খন্দকার শিরোনামে প্রকাশিত হয় : সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের মৃতদেহ শনিবার স্বগ্রাম ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 'পূর্ণ মর্যাদায়' তাকে সমাহিত করা হয়। তখন বিকেল চারটে। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রে। একই সঙ্গে সারাদেশে কারফিউও সামরিক আইন জারি করা হয়। এখনও তা বলবৎ। নতুন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুসতাক আহমদ শুক্রবার রাতে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে বলেন, সবার সঙ্গে সম্প্রীতি। বিশেষ কারও প্রতি নয়। এই আমাদের বিদেশনীতি। আমরা ইসলামিক সম্মেলন, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র জোটবহির্ভূত দেশ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখব। নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তিনি পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যেসব দেশ ... সঙ্গেও মিতালীর চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ রেডিওতে বারবার বলা হচ্ছে, কারফিউ লঙ্ঘনের চেষ্টা করবেন না। রাস্তায় যানবাহন ও লোক চলাচল নিষিদ্ধ। তবে আবশ্যক সংস্থাগুলির কর্মীদের 'পাশে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঢাকা থেকে পিটিআই'র খবর ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোর ৫টায় ঢাকা বেতার থেকে মেজর ডালিম সামরিক অভ্যুত্থানের খবর ঘোষণা করেন। জানানো হয় প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হয়েছেন। নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তাঁরই মন্ত্রিসভার বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ। বিশ্বের সব রাষ্ট্রের কাছে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। সকালের দিকে খন্দকার মুশতাক আহমেদ নিজেও বেতারে জনগণের উদ্দেশে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিনি জানান, নতুন বিপ্লবী সরকারের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সবার সহযোগিতা চাইছেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নতুন তিন বাহিনীর তিন প্রধান নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

মধ্য রাত্রির কিছু পর থেকেই ধানমন্ডি এলাকায় (মুজিবের নিবাস সেখানেই ছিল) গুলির শব্দ পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায়, মুজিবের নিবাসরক্ষীরা প্রতিরোধ করেছিলেন।

ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্ত সংর্ঘষ ঘটে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শহর শান্ত হয়। রাস্তাগুলো ফাঁকা হয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ধানমন্ডিতে রাস্তায় ট্যাংক নামে।

আধাসামরিক বাহিনীর লোকদের নিকটতম সামরিক শিবিরে হাজিরা দেওয়ার জন্য বলা হয়।

আরো জানানো হয়, জনগণ যেন ঘরেই থাকেন। যে যার নিজের কর্তব্য পালন করেন। নতুন সরকারের প্রতি যারা আনুগত্য দেখাবেন না তাদের... হয়েছে। নতুন নাম ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ।

জনসাধারণ যাতে অত্যাবশ্যক জিনিস কেনাকাটা করতে পারেন, তার জন্য শনিবার বেলা সাড়ে ন'টা থেকে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। এই সময় দেশের কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। রেডিও বাংলাদেশের বিভিন্ন বুলেটিনে নির্দেশনামা জারি করা হয়। শ্রমিকদের বলা হয়েছে, আপনারা কাজ চালিয়ে যান। পানি সরবরাহ দফতরকে বলা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে রাজধানীতে পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখুন। পদস্থ নৌ অফিসার এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ : চট্টগ্রাম, মোংলা ও খুলনা বন্দরে যে কোনোভাবেই হোক স্বাভাবিক কাজকর্ম অক্ষণ্ন রাখুন।

সরকার এক নির্দেশে রেশন দোকান খোলা রাখতে বলেছেন। ... বেতারে বলা হয়েছে, রেডিও-টেলিভিশন, ডাক ও তার সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের কর্মীরা কারফিউর সময় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারবেন। তবে সঙ্গে রাখতে হবে পরিচয়পত্র। সেনাবাহিনীর লোকেরা দেখতে চাইলে দেখাতে হবে।

বহু সাবেক সৈনিক সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছেন। নাম লেখানোর জন্য তাঁদের নিকটবর্তী ব্রিগেড কমান্ডে যেতে বলা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে আনন্দবাজারে শোকবার্তা প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে ভারত শোকাহত' শিরোনামে ওই দিনের পত্রিকায় আরো বলা হয় :

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট। ভারত সরকার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর খবরাখবর সতর্কভাবে খতিয়ে দেখছেন এবং অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। বিদেশ দফতরের এক মুখপাত্র বলেন, প্রতিবেশী দেশের এখন রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব যে আমাদের ওপরও পড়বে না, এমন নয়। তবে তা বাংলাদেশেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারের লোকজন নিহত হওয়ার খবরে এখানে গভীর মর্মবেদনা জেগেছে। মুখপাত্র বলেন, 'শেখ মুজিবর রহমানের শোচনীয় মৃত্যুতে ভারত শোকাহত। আমরা তাঁকে সমকালের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উচ্চে আসন দিয়েছিলাম।' মুখপাত্র আরও বলেন, ভারতের জনগণ এই উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রীর মনোভাব গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই আদর্শ আমরা বাস্তবে পরিণত করার কাজ চালিয়ে যাব।

–পিটিআই

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই পাকিস্তান, চীন, সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পর পাকিস্তান এই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

'পাকিস্তান প্রথম স্বীকৃতি দিল' শিরোনামে ওই দিনের পত্রিকায় আরেকটি সংবাদে বলা হয় :

ইসলামাবাদ থেকে রয়টারের খবর– শুক্রবার রাতেই পাকিস্তান বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। পাকিস্তানই ওই সরকারকে প্রথম সমর্থন জানাল।

প্রধানমন্ত্রী জেডএ ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশকে এখনই স্বীকৃতি দিলাম। আমরা আশা করি, ইসলামী সম্মেলনের ৪০টি রাষ্ট্র এবং অন্যান্যরা বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বকে স্বীকৃতি জানাবেন। এই ভ্রাতৃপ্রতিম ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আমাদের প্রীতির নিদর্শন হিসেবে আমরা অবিলম্বে চাল, এক কোটি গজ লংক্লথ ও আরও কিছু জিনিসপত্র পাঠাচ্ছি।

কায়রো: সরকারি মুখপাত্র বলেছেন, ওখানকার ঘটনায় মিশর গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মিসর বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর নজর রাখছে বলে ইউপিআই জানিয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ইন্দিরা গান্ধীর সর্বাত্মক সহযোগিতা, তাঁর সেনাবাহিনী, জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১৯ আগস্ট মঙ্গলবারের পত্রিকায় 'মুজিবের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শোকাহত' শিরোনামে প্রকাশিত হয় :

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আজ শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বলেছেন, শেখ মুজিব 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার এবং উপমহাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর বন্ধুত্ব স্মৃতির মণিকোঠায় চিরভাস্বর থাকবে।

আজ এখানে অনুষ্ঠিত শোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বার্তায় বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। সেখানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব তাঁর পরিবারের লোকজন এবং তাঁর কিছু সহকর্ম নিহত হয়েছেন।

তিনি আরও বলেছেন, শেখ সাহেব সারাবিশ্বের মহান জাতির নেতা বলে স্বীকৃত। তিনি দুর্দমনীয় সাহস ও কঠোর সংকল্প নিয়ে তাঁর জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের জনগণ তাঁকে এই দেশের বন্ধু এবং উপমহাদেশে শুভেচ্ছা ... সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী হিসাবে গভীর শ্রদ্ধা করে। আমরা 'অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি।

আজ এখানে এর স্মৃতিসভায় বাংলাদেশের স্রষ্টা শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়। এই সভায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট এম পিরা এবং সিপিআই'র সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও বক্তৃতা করেন।

দুঃসাহসী যোদ্ধা, রাষ্ট্রনায়ক ও মুক্তিদাতা বলে শেখকে অভিহিত করে কমিউনিস্ট নেতা ... গুপ্ত বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সিআইএ'র মদত নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, শেখকে হত্যা করা মানবতা ও বিবেকের প্রতি অপরাধ।

এই সভায় কংগ্রেস এমপি সৎপাল কাপুর, শ্রীমতী অরুণা আসফ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।...

ভারতের আরেকটি জাতীয় পত্রিকা 'যুগান্তর'-এ ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সংবাদটি 'অভ্যুত্থান : মুজিব ও মনসুর আলী নিহত, সামরিক আইন জারী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয় :

ঢাকা, ১৬ আগস্ট। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী শাসনভার গ্রহণ করেছে। শ্রী খন্দকার আহমদ কয়েক বছর শেখ মুজিবুরের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মেজর ডালিম রেডিও থেকে সমগ্র বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টা কার্ফিউ ঘোষণা করেন। ভোর ৫-১৫ মিনিটে এই অভ্যুত্থান ঘটে বলে জানা যায়। সামরিক অভ্যুত্থানের প্রথম দিকে ভোরে কিছু গুলির আওয়াজ শোনা যায়। তবে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত বলে মনে হয়। ঢাকা বেতার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হওয়ার সংবাদ সকাল আটটা পর্যন্ত বারবার প্রচার করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে মুজিব সম্পর্কে কোনো সংবাদ প্রচার করা হয় নি। টোকিও বেতার থেকে মুজিবের মৃত্যু সংবাদ সমর্থিত হয়নি।

নয়াদিল্লির এক সংবাদে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলি ও শেখ মুজিবের দুই ভাগ্নেকে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় হত্যা করা হয়।

ঢাকা রেডিওর সংবাদে বলা হল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত এবং তাঁর স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে। রেডিওর সংবাদে আরও বলা হয়েছে, খন্দকার মুস্তাক আহমেদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সমস্ত শান্তিকামী ও দেশপ্রেমিক নাগরিককে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশকে নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। এই সংবাদে আরও বলা হয়েছে, যে কেউ এই নতুন বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা করার অথবা এ পর্যন্ত যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা লঙ্ঘন করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। নতুন সরকারকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য বিশ্বের সব শান্তিকামী রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

রেডিওর খবরে প্রকাশ, নতুন সরকার কয়েকটি নির্দেশ জারি করেছেন: (১) আজ সকাল থেকে সমস্ত দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকবে। (২) পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত সকলকে গৃহের অভ্যন্তরে থাকতে বলা হয়েছে, (৩) অনির্দিষ্টকালের জন্য সমগ্র দেশে কার্ফিউ জারি করা হয়েছে।

রেডিওতে কোরআন পাঠের মাঝে মাঝে এই ঘোষণাগুলো করা হয়। রেডিও সংবাদে বলা হয়, সেনা, জাতীয় রক্ষীবাহিনী এবং স্পেশাল সশস্ত্র বাহিনী এই নতুন সরকারকে সমর্থন করছে।

শেখ মুজিবুরের ধানমন্ডির বাসভবনের দিকে সমস্ত রাস্তায় ট্যাঙ্ক পাহারা দিচ্ছে। সেনা ও রক্ষীবাহিনীর লোকদের নিয়ে ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক টহল দিচ্ছে।

প্রাথমিক অবস্থায় যেসব টুকরো খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যায় যে, পশ্চিমা সমর্থক রাজনৈতিক ও সামরিক বাহিনীর লোকেরা এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। শেখ মুজিবুরের ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যারা ঘোর বিরোধী হলেন খন্দকার মুশতাক আহমেদ তাদেরই একজন।

প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলী ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত হননি। তিন জাতীয় নেতা সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আ হ ম কামরুজ্জামানসহ তাঁকে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়েছিল। 'অভ্যুত্থান ঃ মুজিব ও মনসুর আলী নিহত সামরিক আইন জারী' শিরোনামে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলী মৃত্যু সংবাদটি সঠিক নয়।

ওই দিনের ভারতের 'যুগান্তর' পত্রিকার আরেকটি রিপোর্ট 'ভারত মর্মাহত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

নয়াদিল্লি, ১৬ই আগস্ট। শেখ মুজিবুর রহমানের শোচনীয় মৃত্যুতে ভারত সরকার আজ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। জনৈক সহকারী মুখপাত্র আজ সন্ধ্যায় এই বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতা ও তাঁদের পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকার মর্মাহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সরকারি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন যে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করছেন এবং ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখছেন।

তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশের এসব রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভারতে না পড়ে ... থাকতে পারে না। কিন্তু এসব ঘটনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

এই উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ ও সহযোগিতার ... আদর্শ ভারত গ্রহণ করেছে। মুখপাত্র তা পুনরায় বিবৃত ...।

ভারত তার এই আদর্শের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করে যাবে।

পিটিআই ও ইউএনআই: 'মুজিব সমাহিত' শিরোনামে ওই দিন আরেকটি সংবাদে বলা হয়: কলকাতা, ১৬ আগস্ট (ইউএনআই)। বাংলাদেশ বেতার থেকে আজ বিকালে বলা হয়েছে যে, গতকালকার অভ্যুত্থানে নিহত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে আজ অপরাহ্নে তাঁর স্বগ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে 'পূর্ণ মর্যাদায়' সমাহিত করা হয়েছে।

ভারতের দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'দ্য হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট "Mujib buried with `full honcurs / Khondkar Govt clamps curfew in Bangladesh' `Dacca closer to Islamic Camp' শিরোনামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়:

CALCUTTA, Aug. 16 (UNI, PTI): Thirty six hours after yesterday's army coup which ousted the Mujibur Rehman Government. Bangladesh remained curfew- hound and cut off from the rest of the world.

President Khondkar Mushtaque Ahmed reviewed the situation in the country at a meeting of his Cabinet today and "expressed satisfaction at the overall situation." Radio Bangladesh said.

The radio, the only source of information following the happing of telecommunication links and sealing of the country's borders, reported that the curfew was relaxed for three hours from 9.30 a.m to enable the people to buy their ration. According to the radio. there had been no report of any untoward incidents during the curfew relaxation.

The body of Sheikh Mujib, who was killed in yesterday's coup, was buried with "full honours '' in the family burial around in Tungipara in Faridpur district this afternoon Radio Bangladesh reported this evening.

The radio said the body had been taken from Dacca to his home village.

At the cabinet meeting, which lasted 40 minutes, Mr. Ahmed asked all the Ministers to look after the departments they hold charge of under the Mujib Government. All the other portfolius, including Home affairs, would be held by the president, the radio reported.

The radio informed its listeners be Pakistan's recognition of the new Government. Mr Ahmed expressed his thanks to Pakistan for according it recognition, the radio said.

While reiterating his Government's determination to establish friendly and cordial relations with all countries. Mr. Ahmed said Bangladesh would be in close touch with the 40 nation Islamic Conference.

The radio said people belonging to different walks of life had halled the leadership of Khondakar Mushtaque Ahmed with the backing of the army and expressed the hope that the nation would march towards progress and prosperity.

They said the army's action was the right step to save the country from chaos and confusion and ensure the toward march of the nation.

The Ex-servicemen 's Association has expressed its complete allegiance to the new President and their services at the disposal on the military command.

Movement of public and private vehicles was strictly prohibited during the curfew hours through out Bangladesh. The radio said that only essential services.

The radio continued to broadcast warnings to the people against violating the curfew.

Indian airlines and Bangladesh Biman cancelled their seheduled flights between Calcutta and Dacca.

The military backed Government headed by Mr. Khondker Mushtaque Ahmed assured office and proclaimed martial law in Bangladesh yesterday after a swift early morning coup in which President Mujibur Rehman and Prime Minister Mohammed Mansoor Ali were killed. The Sheikh was killed in his official residence.

এই সংবাদেও প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর মৃত্যু সংবাদটি ভুল ছিল।

'2 nephews Killed' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়:

Sheikh Mujib's two nephews are believed to be Sheikh Moni and Sheikh Shahidul Islam both were politically prominent and close to the Sheikh.

The Associated Press said that the country had been re-designated as the Islamic Republic of Bangladesh. It had so far been known as the people's Republic of Bangladesh wedded to secularism, socialism, democracy and nationalism.

Sheikh Moni was editor of Bangladesh Times and Sheikh Islam secretary of the student from of the Bangladesh Krishak Shramik Awami Leauge, the sole political party in the country.

The Sheikh had other nephews as well...

এই সংবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই ভাগ্নের মৃত্যু সংবাদের কথা বলা হয়েছে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর এক ভাগ্নে মেজ বোনের ছেলে শেখ ফজলুল হক মণি ও আরেক ভাগ্নে সেজ বোনের কনিষ্ঠ ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত নিহত হয়েছিলেন।

ওই পত্রিকার আরেকটি সংবাদে ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট 'Internal matter, feels India' শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার না চেয়ে বরং এটা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ভারতের এড়িয়ে যাওয়ার চিত্রও পাওয়া যায়। এই সংবাদে সে সম্পর্কে বলা হয় :

NEW DELHI, Aug. 16 (PTI). The Government of India said today that India could not remain unaffected by the political developments in a neighboring Country, "but they are internal matters of Bangladesh."

In the first official comment on the developments in Bangladesh, a spokesman of the Eternal Affairs Ministry said the Government was "carefully studying" the reports and "watching the developments".

The people of India are committed to 'a vision of co-operation and friendship' among the countries of the sub-continent and the spokesman said that "we shall continue to strive for the achievement of this ideal."

He expressed India's "great shock" over reports of killing of political leaders and their farnilies.

He said that they were "deeply grieved" by the tragic death of Sheikh Mujibur Rahman who led the national struggle for liberation with steadfastness and courage.

"we held him in high esteem in India as one of the outstanding personalities of our time" he said.

The spokesman's statement read: The Government of India are carefully studying reports of recent events in Bangladesh and watching developments. We cannot remain unaffected by these political developments in a neighbouring country but they are internal matters of Bangladesh.

Reports of the killing of political leaders and their families have come as a great shock. we are deeply grieved by the tragic death of Sheikh Mujibur Rahman who led the national struggle for liberation with steadfastness and courage. we held him in high esteem in India as one the outstanding personalities of our time.

The people of India are committed to a vision of co-operation and Friendship among the countries of the sub-continent. We shall continue to strive for the achievement of this ideal.

ভারতের আরেকটি দৈনিক পত্রিকা দ্য সানডে স্টেটসম্যান এ ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট "India Keeping Watch On Events In Bangladesh Grief Over Mujib's Tragic Death" শিরোনামে সংবাদে বলা হয় :

NEW DELHI, Aug 16। India is "Carefully Studying" reports of events in Bangladesh and "Watching developments" but an official spokesman made it clear today that these are considered "Internal matters of Bangladesh."

In a statement the spokesman expressed deep grief at "the tragic death of Sheikh Mujibur Rahman who led the national struggle for liberation with steadfastness and courage. We held him in high esteem in India as one of the outstanding personalities of our times."

Referring to the situation on the sub-continent as a whole, the spokesman said India wanted cooperation and friendship among Government would "continue to strive for the achievement of this ideal."

While the Government feels that recent developments are "Internal matters of Bangladesh", the spokesman said, "we cannot remain unaffected by these political developments in a neighbouring country."

Meanwhile, Dr. Kamal Hossain, Bangladesh's Foreign Minister under Sheikh Mujibur Rahman's Government, did not arrive here as scheduled from Frankfurt for a two-day visit. The spokesman denied reports by a foreign news agency that Dr. Hossain had arrived and been whisked away from the airport. Nothing was known here about Dr. Hossain's whereabouts.

The following is the text of the statement of the official spokesman of the Ministry of External Affairs. "The Government of India is carefully studying reports of receive events in Bangladesh and watching developments. We cannot remain unaffected by these political developments in a neighbouring country but they are internal matters of Bangladesh.

"Reports of the killing of political leaders and their families have come as a great shock. We are deeply grieved by the tragic death of Sheikh Mujibur Rahman who led the national struggle for liberation with steadfastness and courage. We held him in high esteem in India as one of the outstanding personalities of our time.

"The People of India are committed to a vision of cooperation and friendship among the countries to strive for the achievement in this ideal."

বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফন প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'পূর্ণ মর্যাদায় সাবেক রাষ্ট্রপতির লাশ দাফন' শিরোনামে বলা হয় : সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ শনিবার বিমানযোগে ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে তাদের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়। একজন সরকারী মুখপাত্র একথা জানান বলে গতকাল বাসস'র খবরে বলা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী, সন্তান, পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য সদস্যদের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে কোনো নিন্দা প্রকাশ হয়নি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। নীতির আদর্শে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তাই বলে, যাঁর নেতৃত্বে, যাঁর আহ্বানে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর 'জয় বাংলা' স্লোগান বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের শাস্তি চেয়ে সেদিন বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহল কোনো বক্তব্য দেননি।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক যুগান্তর

একটি শোক মিছিলের সংবাদ

মো. মিনহাজ উদ্দীন

উপমহাদেশ ইতিহাসে মিছিল বা শোক মিছিল নতুন কিছু নয়। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে যেমন হরতাল পালিত হয়েছে, ঠিক তেমনি একসঙ্গে চলেছে মিছিল। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে হয়েছে শোক মিছিল, আবার কখনো কখনো এ রকম মিছিল থেকে সহিংস বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশে এখনো মিছিল নিত্যদিনের ঘটনা। শোক মিছিলও দেখা যায় মাঝেমধ্যে, যা অনেকের কাছে শোকযাত্রা বা শবযাত্রা নামেও পরিচিত। আমরা আজ কথা বলতে চাই এমনই একটি শোক মিছিলের সংবাদ নিয়ে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতির দুঃখজনক এক আখ্যান।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক কলঙ্কিত দিন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসে এক ন্যক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এই দিনে। এই দিনে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ শাহাদতবরণ করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও রাষ্ট্রযন্ত্রে ক্ষমতার পালাবদলের পর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নির্বাসিত। যে ভোরে ভয়ানক এই ঘটনা ঘটল, সেদিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পত্রিকার পাতায়ও ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওইদিন বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে যাওয়ার কথা ছিল। সে বিষয়ে বিভিন্ন খবর ও বিশেষ ক্রোড়পত্র ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলাসহ অন্য পত্রিকাগুলোয়। তবে ১৬ আগস্ট থেকেই বদলে যায় সবকিছু। ১৭ আগস্ট শুধু বঙ্গবন্ধুর দাফনের খবর

প্রকাশিত হয়েছিল অত্যন্ত ছোট পরিসরে। এরপর টানা আড়াই মাস গণমাধ্যমে শেখ মুজিবের নাম ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। দু-এক লাইন লেখা হলেও তা ছিল ভীষণ নেতিবাচক। আর তাঁর বিশেষণ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দের ব্যবহার ছিল সুদূরপরাহত কষ্ট কল্পনা। যাই হোক, ১৫ই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে প্রকাশিত প্রথম খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পর ৪ নভেম্বর পূর্বনির্ধারিত একটি শোক র‍্যালি বের হয়েছিল ঢাকা শহরে। সেই মিছিলকে নিয়েই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকার পাতায়। বলা যায়, আবার পত্রিকার পাতায় ফেরেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, ওই শোক মিছিলের আয়োজক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারা। সে সময়ের ডাকসু নেতারা বিশেষ করে সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সহকর্মী সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এই শোক মিছিলটিতে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা। যাতে যোগ দেন নগরীর অগণিত নারী-পুরুষ। এছাড়া এই শোক মিছিলে আরো ছিলেন ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানকারী খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই। এই শোক মিছিলটিতে সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাধারণ ছাত্রও যোগ দিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক মো. শাহ আলমগীর। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এ মিছিলটি সম্পর্কে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫' গ্রন্থে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৬), 'জানলাম মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ফুল দিয়ে এসেছে। এটি একটি মস্ত বড় ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিলটির আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি দিবস পালনের জন্য ওই মিছিলটির আয়োজন করেছিল। ওই মিছিলে ছিলেন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ, সংসদ সদস্য শামসুদ্দিন মোল্লা, সংসদ সদস্য রাশেদ মোশারফ, মরহুম খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, মোহাম্মদ মহসীন মন্টু, বেগম মতিয়া চৌধুরী, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসমত কাদির গামা, খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধ মাতা প্রমুখ।' এই শোকযাত্রায় যোগ দিতে ধানমন্ডির বাসিন্দা কবি সুফিয়া কামাল, কবি জসীমউদ্‌দীন, বরেণ্য চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনসহ আরও বেশ কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তিকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে কবি সুফিয়া কামাল শোকযাত্রায় যোগ দিতে পারেননি। আর অন্যরা ঠিক কী কারণে যোগ দেননি তা আজও অজ্ঞাত।

১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বরের এই মিছিলটির খবর গুরুত্ব সহকারে পরের দিন জাতীয় দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত হয়। আবার পত্রিকার পাতায় লেখা হয় বঙ্গবন্ধু শব্দটি। ইত্তেফাক ছাপে 'শহরে মৌন মিছিল' শিরোনামের খবর। দৈনিক বাংলার শিরোনাম– 'ছাত্রদের মৌন মিছিল: বঙ্গবন্ধু রুহের মাগফেরাত কামনা'। দুটি ইংরেজি পত্রিকা Bangladesh Observer ও Bangladesh Times খবর প্রকাশ করে 'Homage paid to Bangabandhu' ও 'Homeage to mujib' শিরোনামে।

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'ছাত্রদের মৌন মিছিল: বঙ্গবন্ধু রুহের মাগফেরাত কামনা' শিরোনামের সংবাদের বর্ণনা ছিল এরকম– 'মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ছাত্রদের একটি মৌন মিছিল বের করা হয় এবং ১১টা ১৫ মিনিটে মিছিলকারীরা ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বার সড়কে উপস্থিত হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মিছিলটির পুরোভাগে বঙ্গবন্ধুর বিশাল একটি প্রতিকৃতি ছিলো। মিছিলে বিপুল সংখ্যাক ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলারা যোগ দেন। বটতলা থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন অভিমুখী এই মিছিল নীলক্ষেত সড়ক ও নিউমার্কেট হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পথ অতিক্রম করে। বত্রিশ নম্বর বাসভবনে পৌঁছে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চারটি প্রতিকৃতি লাগিয়ে দেন এবং এর উপর পুষ্পমাল্য ও ফুল ছিটিয়ে দেন। তারা বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। পরে মিছিলটি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ফিরে এসে শেষ হয়। বিকেলে শহীদ মিনারে এক ছাত্র জমায়েত হয়। জমায়েত শেষে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পুরান হাইকোর্ট ও প্রেসক্লাব হয়ে বায়তুল মোকাররমে গিয়ে শেষ হয়।' (দৈনিক বাংলা, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫)।

তবে ৪ নভেম্বর প্রকাশিত পত্রিকাতে সেই শোক র‍্যালির সংবাদ খুব বেশি বিস্তারিত পরিসরে প্রকাশিত হয়নি। ওই শোক র‍্যালির আয়োজন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটে, যা থেকে যায় অন্তরালে। ওই শোক মিছিলের সংগঠক ও অংশগ্রহণকারী তৎকালীন ছাত্রনেতা নূহ-উল-আলম লেনিন ও অজয় দাশগুপ্ত 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও প্রতিবাদের প্রথম বছর' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। তাতে তারা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। সেই বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী– '... ৪ নভেম্বর সকাল থেকেই বটতলাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হতে থাকেন। ... বটতলা হয়ে যায় ছাত্র-জনতায় পরিপূর্ণ। ... কলাভবনের গেট থেকে ছাত্র-জনতার মিছিল বিনা বাধায় বের হয়। কিন্তু নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির কাছে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনী আমাদের গতিরোধ করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বাদানুবাদ। এক পর্যায়ে তারা মিছিলে হামলা করতে উদ্যত হয়। তারপরও ছাত্র জনতা পিছু হটেনি। শেষ পর্যন্ত মিছিলকারীদের দৃঢ় মনোভাবের কাছে বাধাদানকারীরা হার মানে। উঠে যায় ব্যারিকেড। আমরা এগিয়ে চলি আর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছ থেকে বড় একটা সমাবেশ আমাদের মিছিলের সাথে যুক্ত হয়। কলাবাগানে অপেক্ষায় ছিল আরেকটি সমাবেশ। তারাও শামিল হল মিছিলে। এদের মধ্যে ছিলেন খালেদ মোশাররফের মা।' (পৃষ্ঠা ১০৩)।

ঐতিহাসিক এই শোক র‍্যালির আয়োজনের নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন ডাকসুর সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। মিছিলটির আয়োজন ও সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট সকালে লেখক তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম জানান, এই শোক মিছিলটির প্রস্তুতি চলছিল অনেক আগে থেকেই। পরিকল্পনা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য একটি শোক মিছিল করা হবে। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল মিছিলটি হবে ২৮ অক্টোবর। কিন্তু প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকার কারণে পরবর্তী তারিখ ৪ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়। এই তারিখের সঙ্গে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ঘটনাপ্রবাহের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই শোক মিছিলের অনুমতি বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে অবহিত করা নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের তথ্য তুলে ধরছেন– বিষয়টি উল্লেখ করে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মঞ্জুরুল আহসান খান ও রাশেদ মোশাররফ (তৎকালীন সংসদ সদস্য, খালেদ মোশাররফের ভাই) ছিলেন একই এলাকার বাসিন্দা। ৪ নভেম্বর ভোরে মঞ্জুরুল আহসান খান তাঁর চামেলিবাগের বাসা থেকে ফোন করেছিলেন রাশেদ মোশারফকে। মূলত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ জানতেই তিনি ফোনটি করেন। ওই সময় রাশেদ মোশাররফ জানান, ভাই (খালেদ মোশাররফ) এখানেই আছেন। তখন মঞ্জুরুল আহসান খানের সঙ্গে খালেদ মোশাররফের কথা হয়। ওই সময় মঞ্জুরুল আহসান খানের পাশে ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। খালেদ মোশাররফ ও মঞ্জুরুল আহসান খানের কথার মধ্যেই একপর্যায়ে খালেদের সঙ্গে কথা হয় মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের। তিনি তখন খালেদকে ৪ নভেম্বরের পূর্বনির্ধারিত শোক র‍্যালির কথা জানান। এ সময় খালেদ তাঁকে বলেন, 'আমার ছেলেরা তোমাদের বাধা দেবে না।' এ সময় মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম তাঁকে (খালেদ মোশাররফ) এই মিছিলে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। হেসে জানান তিনি পারবেন না, তবে তাঁর মা মিছিলে থাকবেন। এরপর মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এ মিছিলের ঘটনাপ্রাবাহ সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে বর্ষীয়ান রাজনীতিক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই লাইনে মিছিলটি বের হয়। নীলক্ষেতে এটি বাধার মুখে পড়ে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে মিছিলটি এগিয়ে যায়। ৩২ নম্বরে পৌঁছার পর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। একজন হুজুর মোনাজাত করেন।

ঐতিহাসিক এই মিছিলটি নিয়ে ৫ নভেম্বর খবর প্রকাশিত হলেও বিস্তারিত এসব ঘটনা কখনোই সামনে আসেনি। বলা যায়, ওই দিনের খবরটি ছিল বেশ দায়সারা গোছের। এর পেছনে প্রাসঙ্গিক হিসেবে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ। খন্দকার মোশতাকের ডানপন্থী বলয় শেখ মুজিবকে গণমাধ্যমে আসতে দেয়নি। এক্ষেত্রে ওই সময়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকরাও কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখেননি। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট পূববর্তী সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য ছিলেন। তাদের অনেকেই আবার বঙ্গবন্ধুর নতুন রাজনৈতিক প্রচেষ্টাতে যুক্ত হয়েছিলেন অতি উৎসাহের সঙ্গে। ১৯৭৫ সালের ২ মার্চ নতুন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, অবজারভারের সম্পাদক শহিদুল হক, দৈনিক সংবাদের সম্পাদক বজলুর রহমান, দৈনিক বাংলার সম্পাদক নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, পূর্ব দেশের সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, মর্নিং নিউজের সম্পাদক শামছুল হুদা, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক জাওয়াদুল করিম ও বিপিআই'র সম্পাদক মিজানুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর গুণমুগ্ধ এই সম্পাদকরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বা খুনিদের বিপক্ষে কোনো ভূমিকা রেখেছিলেন কি না, তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না, তারও কোনো সামান্য আলামত তন্ন তন্ন করেও পাওয়া যায় না। তবে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে। ওই রাতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন। যাতে পরিবর্তিত হয় অনেক কিছু। যার প্রেক্ষাপটেই পূর্ব থেকে পরিকল্পিত ৪ নভেম্বর এই শোক র‍্যালিটি ঢাকার রাজপথে নামতে পারে। যদিও খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান চেষ্টা সফল হয়নি। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালেই পাল্টা এক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ চলে যায় অন্য এক ডানপন্থি বলয়ে। তখন বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো বাধ্য হয়ে অথবা নিজেদের সিদ্ধান্তে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) জীবন, কর্ম, চিন্তা, দর্শন ও আদর্শ বাঙালির প্রেরণার উৎস। এই কর্মবীর ও ত্যাগী রাষ্ট্রনায়কের জীবনে, মননে, সৃজনে ও চেতনে বইয়ের বিরাট অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২), তাঁর চিঠিপত্র, ডায়েরি, বক্তৃতা, ভাষণ, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও দলীয় পাঠাগার, লেখক-গবেষক-অধ্যাপক, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও নিকট আত্মীয়দের সূত্রে তাঁর বইপড়া, বইপ্রীতি, বই সংক্রান্ত অবহিতি, পাঠস্পৃহা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রনায়ক জীবনে তিনি অসংখ্য বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা পড়েছেন। ব্যক্তিগত-পারিবারিক ও দলীয় পর্যায়ে স্থাপন করেছেন পাঠাগারও।

বঙ্গবন্ধুর সেই বইপড়া ও বইপ্রীতি সম্পর্কে আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এর ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই মহান নেতার আদর্শ অনুসরণ করে বইপড়া তথা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কল্যাণব্রতে সচেষ্ট হবে।

'বঙ্গবন্ধুর বই পড়া' শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে বঙ্গবন্ধুর জন্ম। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি সরকারি চাকরি

করতেন। আদরের পুত্র খোকার (বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ডাকনাম) জন্য তিনি বাড়িতে তিনজন শিক্ষক রেখেছিলেন। একজন ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য মৌলবি, দ্বিতীয়জন সাধারণ শিক্ষার জন্য পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ আর তৃতীয়জন কাজী আবদুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু মৌলবির কাছে 'আমপারা' আর পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা পড়তেন এবং কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা-গল্প ও ইতিহাস।[১] এভাবে পারিবারিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী সময়ে স্কুল ও কলেজজীবনে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যবই বঙ্গবন্ধুর পড়ার তালিকায় যোগ হয়। পড়ার সুযোগ নিয়ে জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু। পিতা-মাতার স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে তিনজন গৃহশিক্ষক ও স্কুলশিক্ষকদের শিক্ষার পাঠদানের বাইরে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বড়ো ধরনের পাঠের সুবর্ণ সুযোগ ছিল বাড়িতে নিয়মিতভাবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়া। এ সম্পর্কে জানা যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন– 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম'।[২]

সেই ১৯৩০ দশকে সুদূর মফস্বল বাংলার গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়ায় আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন সংবাদপত্র পাঠ করে কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান দেশ-বিদেশের খবর ও জ্ঞানার্জন করতেন। পরবর্তীকালেও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, আদর্শ ও মানস গঠনে সংবাদপত্র পাঠ অব্যাহত ছিল এবং তিনি নিজে সংবাদপত্রে কাজও করেছেন বিভিন্ন ভূমিকায়। এভাবেই তিনি হন বইবন্ধু এবং পাঠকবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর পাঠস্পৃহা ছিল অপরিমেয়। শিক্ষাজীবনের বাইরে ছাত্র রাজনীতি ও জাতীয় রাজনৈতিক জীবন, কারাবন্দি জীবন, হুলিয়া জীবন, মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা জীবন, অন্যান্য সময় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শহিদ হওয়ার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ছিলেন বইবান্ধব ও বইপ্রেমী। তিনি দেশি-বিদেশি লেখকদের বিভিন্ন ধরনের বই পড়তেন। তিনি পড়তেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রাজনীতি, ইতিহাস সংক্রান্ত বইপুস্তক। তাঁর গ্রন্থপাঠ নিবিষ্টতা ও স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণ-আলোচনা-বিবৃতি-সাক্ষাৎকারে, তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা-গান-সংলাপ ও উদ্ধৃতি দেয়ার মধ্যে। রবীন্দ্র-নজরুল-ডি এল রায়ের কবিতা-গল্প, সিরাজদ্দৌলা নাটকের সংলাপ, শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর-সূর্য সেনের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ তিনি কম্পিউটারের মতো মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর পাঠ ও অধ্যয়ন পরিধি ছিল বিচিত্র ও বিস্ময়কর। জেলজীবন ও পলাতক সময়েও বই এবং পত্রপত্রিকা ছিল তাঁর সঙ্গী।

২

১৯৪০ দশকের শুরুতে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পিতা শেখ লুৎফর রহমানের উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা। ওই সময় বঙ্গবন্ধুর পিতা লেখাপড়ার বিষয়ে কি উপদেশ দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে জানা যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে। বঙ্গবন্ধুর পিতা তখন তাঁকে বলেছিলেন–

'বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছো, এতো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না'।[৩]

বঙ্গবন্ধু পিতার সে উপদেশ কখনো ভুলেননি। কলকাতায় অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিমের স্নেহধন্য হন। আবুল হাশিম ছিলেন রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী। আবুল হাশিম তাঁকে লাইব্রেরি গড়া এবং লেখাপড়া সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'হাশিম সাহেব আমাদের বললেন, একটা লাইব্রেরি করতে হবে তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে'।[৪] ব্যস্ততম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু বই পড়তেন। তিনি লিখেছেন-'আমরা প্রায়ই লীগ অফিসে কাটাতাম। রাতে একটু লেখাপড়া করতাম'।[৫]

উপরিউক্ত লেখা থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু বই পড়ার প্রতি কতটা সিরিয়াস ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর এসব প্রচণ্ড চাপের মুখেও বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। যেসব বইপত্র তিনি বন্ধুবান্ধবদের পড়ার জন্য ধার দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ফেরত চেয়ে নেন। তিনি হোস্টেল ছেড়ে সব বইপত্র নিয়ে চলে যান তাঁর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শেখ শাহাদাত হোসেনের কাছে হাওড়ার উল্টোডাঙা এলাকায় এবং পরে কলকাতায় বসবাসরত ছোটবোন ও তাঁর স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। ওখানে ভালো মতো লেখপাড়া করে তিনি বিএ পাস করেন।[৬]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজধানী। ওই সময় অন্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুও ঢাকায় চলে আসেন। এখানে এসেও তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগী হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আইন পড়ার জন্য। এ সম্পর্কে লিখেছেন তিনি–

'আমি ঢাকায় চলে এলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, আইন পড়ব। বইপুস্তক কিছু কিনলাম'।[২]

৩

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাসের পর কয়েকটি বই বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে আলোড়িত করেছিল, সে ব্যাপারে জানা যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, সবারই আশা ছিল পাকিস্তান দুটো হবে– একটি হবে পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান।[৮]

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমার কাছে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ থাকত। আর হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেবের 'পাকিস্তান' বইটা এবং মুজিবুর রহমান খাঁ সাহেবও 'পাকিস্তান' নামে একটা বিস্তৃত বই লিখেছিলেন সেটা; এই দুইটা বই আমার প্রায় মুখস্থের মতো ছিল। আজাদের কাটিং আমার ব্যাগে থাকত। সিপাহী বিদ্রোহ এবং ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাসও আমার জানা ছিল। কেমন করে ব্রিটিশরাজ মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, কি করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে হিন্দুদের সাহায্য করেছিল, মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি, সিপাহীর চাকরি থেকে কিভাবে বিতাড়িত হল–মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করতে শুরু করেছিল ইংরেজরা কেন? মুসলমানরা কিছুদিন পূর্বেও দেশ শাসন করেছে তাই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারে নাই। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ওহাবি আন্দোলন কি করে শুরু করেছিল হাজার হাজার বাঙালি মুজাহিদরা? বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে সীমান্ত প্রদেশে যেয়ে জেহাদে শরিক হয়েছিল। তিতুমীরের জেহাদ, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়জী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেই আমি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস বলতাম'।[৯]

১৯৪৭ সালে কোন কোন অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে, এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' নামের গ্রন্থে। এ গ্রন্থে কলকাতাকে বাদ দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক একতরফাভাবে ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঘোষণারও প্রসঙ্গ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থটি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন– 'নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কোনো দাবি রইল না। এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন কলকাতা নিয়ে কি করবেন? 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' বইটা পড়লে সেটা দেখা যাবে। ... এই বইতে আরও আছে, একজন ইংরেজ গভর্নর হয়ে ঢাকা আসতে রাজি হচ্ছিল না, ফলে ঢাকায় খুব গরম আবহাওয়া তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল– 'পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোনো কষ্ট হবে না'। অর্থাৎ দার্জিলিংও আমরা পাবো। তাও নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই ঘোষণায় শেষ হয়ে গেল'।[১০]

৪

রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ আমলে এবং স্বাধীন পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুকে প্রায় ১৬ বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। এই জেলজীবনে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিল বই। অন্যদিকে 'হুলিয়া'র কারণে গোপন জীবনেও ছিল বই। এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে।

রাজনৈতিক কারণে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় এমন অবস্থায়ও তিনি বই পড়তেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'এভাবে পালিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা হল না, আর ভালও লাগছিল না। আমি আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালাল উদ্দীনকে বললাম, তোমাদের কাছেই থাকব। তারা তখন আলী আমজাদ খান সাহেবের পুরানা বাড়ি খাজে দেওয়ানে নিচের তলায় থাকত। আমি চলে আসলাম ওদের কাছে। দিনভর বই পড়তাম, রাতে ঘুরে বেড়াতাম। ঠিক হলো, আরমানিটোলা ময়দানে একটা সভা ডাকা হবে। আমি সেখানে বক্তৃতা করব এবং গ্রেফতার হব'।[১১]

বঙ্গবন্ধুর এই বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি যেমন বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তেমন ছিলেন সাহসিকতা এবং মনোবলেও দৃঢ়।

জেলজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বইপড়া, সন্তান ও স্ত্রীকে বইপড়া সম্পর্কে উপদেশ প্রদান এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে নির্দিষ্ট বিষয়ে বই পাঠানোর অনুরোধ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনী ও চিঠিপত্রে।

পাকিস্তান-উত্তর পরিবেশে শামসুল হক ও অন্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ঢাকা জেলে বন্দি ছিলেন। ওই সময় শামসুল হকের নববিবাহিত স্ত্রী আফিয়া খাতুন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমি বেগম হককে ভাবী বলতাম, ভাবী আমাকেও দু'-একখানা বই পাঠাতেন। হক সাহেবকে বলে দিতেন, আমার কিছু দরকার হলে যেন খবর দেই। আমি ফুলের বাগান করতাম। তাদের দেখা হবার দিনে ফুল তুলে হয় ফুলের মালা, না হয় তোড়া বানিয়ে দিতাম'।[১২]

বই এবং ফুল বঙ্গবন্ধুর কত প্রিয় ছিল এ থেকে তা প্রমাণিত হয়।

১৯৫০ সালের শেষদিকে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ওই সময়ও তাঁর সঙ্গী ছিল বই, পত্রিকা এবং ফুলের বাগান চর্চা। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমি এই প্রথম ফরিদপুর জেলে আসলাম। ... বই আমার কাছে যা আছে তাই সম্বল। খবরের কাগজ দিতে বললাম। হাসপাতালের সামনে জায়গা ছিল, একটা ফুলের বাগানও ছিল, তাকে যাতে আরও ভাল করা যায় তার ভার নিলাম'।[১৩]

ফরিদপুর জেলে বন্দি থাকার সময় বঙ্গবন্ধু পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এর বাংলা তরজমাও পড়তেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'আমি তখন নামাজ পড়তাম এবং কোরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরিফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি'।[১৪]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়, বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত ইসলাম ধর্মনিষ্ঠা এবং মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সারমর্ম অনুধাবনের জন্য আরবি ভাষার পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায়ও এর তরজমা পাঠ করার বিষয়টি।

৫

বই এবং পাঠাভ্যাসের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রবল আকর্ষণ সম্পর্কে জানা যায় জেলখানা থেকে লেখা চিঠি থেকেও। ১৯৫১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) কাছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

'মানিক ভাই ১২-০৯-৫১

আমার সালাম নেবেন। আমার মনে হয় আপনারা সকলে আমার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। চিকিৎসার চেষ্টা খুবই হইতেছে...। আমার জন্যে কিছুই পাঠাবেন না। আমার কোনো কিছুরই দরকার নাই। নতুন চীনের কিছু বই পত্রিকা যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন।...।

আপনার ছোট ভাই
মুজিব'।[১৫]

এই চিঠিতে বর্ণিত বই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হান্নান লিখেছেন–

'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার একটা বড়ো ধরনের পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে এই চিঠিতে। আর তা হলো, 'নতুন চীনের কিছু বই-পত্রিকা যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন...'। এই চিঠি লেখার মাত্র দু'বছর আগে ১৯৪৯ সালে কমরেড মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তরুণ-যুব রাজনীতিক মুজিবকেও দেখছি তা আকর্ষণ করেছিল। এ ইতিহাসটি এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ইতিহাসে অনাবিকৃতই রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটেই হয়তো ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রথম সফর তালিকায় চীনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন'।[১৬]

বঙ্গবন্ধুর বই পাঠের পরিধি ও বিষয়বস্তুর নির্বাচন ছিল খুবই ব্যাপক। বাংলাদেশের বহু কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে যেমন ছিল তাঁর সান্নিধ্য ও পরিচয়, তেমনি তাঁদের লেখালেখি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অবহিত। একবার লেখক শওকত ওসমান সম্পর্কে কেউ কেউ অনুযোগ তুললে বঙ্গবন্ধু তাঁদের শওকত ওসমানের লেখালেখি সম্পর্কে অবহিত হতে পরামর্শ দিয়ে নিজের বিছানার তলা থেকে তাঁর লেখা বই 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' বের করে দিয়ে বলেছিলেন, এটা তারা পড়েছেন কিনা। এই তথ্য জানা যায় শওকত ওসমানের নিজের বর্ণনায়।[১৭]

অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহীমের লেখা থেকেও জানতে পারি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক তাঁর (নীলিমা ইব্রাহীম) লেখা বই পড়ার কথাও। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নীলিমা ইব্রাহীম দেখা করতে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনার অনেক বই আমি জেলে বসে পড়েছি'।[১৮]

মুক্তিযোদ্ধা-লেখক-গবেষক আবীর আহাদকে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু এডগার স্নো রচিত বহুল পঠিত গ্রন্থ 'রেড চায়না'র একটি কপি দিয়ে তাঁকে বইটি ভালোভাবে পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন বলে এক সাক্ষাৎকারে আবীর আহাদ জানিয়েছেন।[১৯]

৭

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির নেতা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান বাহিনী নৃশংসতা চালায় নিরীহ বাঙালির ওপর। বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের পর বাংলাদেশ শত্রু ও দখলদারমুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানের কারাগার থেকে। ক্ষত-বিক্ষত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পুনর্গঠনের দায়িত্ব পড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ওপর। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে সব প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। এর ছাপ পড়ে লেখক সমাজ ও বইয়ের ওপর। পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় অবস্থায় বাংলাদেশের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি-মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে অসংখ্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধের বই। বাংলা একাডেমি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় অনেক বই।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই প্রকাশ, প্রচার, বিপণন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এগিয়ে আসে নতুন উদ্যম নিয়ে। আয়োজন করে ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা (১৯৭২), জাতীয় গ্রন্থমেলা (১৯৭৪) এবং চট্টগ্রামে জাতীয় গ্রন্থমেলার (১৯৭৫)। গ্রন্থকেন্দ্রের মাসিক পত্রিকা 'বই' নতুন আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে 'বই'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে (৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা)। এ সংখ্যায় সর্বমোট লেখার সংখ্যা ছিল ৪২টি। এর মধ্যে কবিতা ছিল ৩৬টি। অন্নদা শঙ্কর রায়ের 'বঙ্গবন্ধুকে' নিয়ে লেখা সেই বিখ্যাত কবিতাটিও 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান'ও ছিল এই সংখ্যায়।

আরো ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদ লেখক, অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের প্রতি সচিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। এসবই ছিল বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবনার ফসল।

১৯৭২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষ্যে সাত দিনব্যাপী গ্রন্থ প্রদর্শনী। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ উপলক্ষ্যে এক বাণী দেন। তিনি আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উৎসব ও গ্রন্থ প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাণীতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের শান্তিকামী ও জ্ঞানপিপাসু মানুষের সাথে পরিচিত হতে পারবে।[২০]

বঙ্গবন্ধুর সংগৃহীত বই, বই পাঠের তৃষ্ণা এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরির কথা দেশ-বিদেশের লেখক-সাংবাদিক-গবেষক-রাজনৈতিক সহকর্মী-পারিবারিক সদস্যদের বর্ণনায় কিংবদন্তিসম উল্লেখ পাওয়া যায়। ধানমণ্ডির ৩২নং বাড়িতে ব্যক্তিগত পাঠাগারে আলমারিভর্তি বইয়ের পাশে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসা অবস্থায় বইপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর একটি আলোকচিত্র ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। ধানমণ্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি ও সংগৃহীত বই সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবেগময় স্মৃতিময় বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন–

'১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁজরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২.৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হলো। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা

প্রচার শুরু করলেন। যে মুহূর্তে এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে পৌঁছল, তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১.৩০ মিনিটে তারা আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজ মনে পড়ে সে স্মৃতি। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৬শে মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনোমতে দেওয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাঙচুর করে, বাথরুমের বেসিন, কমোড, আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়। দীর্ঘ নয় মাস ধরে এই বাড়ি লুট হতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক গ্রুপ লুট করে যাবার পর আরেক গ্রুপ আসত। সোনাদানা, জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা সব এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার এবং মা'র যে গহনা লকারে ছিল সেগুলি বেঁচে যায়, কিন্তু চাবি হারিয়ে যায়।

ছয়দফা দেবার পর অনেক সোনা-রুপার নৌকা, ৬-দফার প্রতীক প্রায় ২-৩শ' ভরি সোনা ছিল। এগুলো আমার ঘরের স্টিলের আলমিরায় রাখা ছিল। সব লুট করে নিয়ে যায়। যাক, ওসবের জন্যে আফসোস নেই, আফসোস হলো বই। আব্বার বহু পুরোনো কিছু বইপত্র বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলো সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ সাল থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন, কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল, যা সবসময় আব্বার সঙ্গে যেত।

জেলখানায় বই বেশির ভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন; কিন্তু আমার মা'র অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনো দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নাড শ, রাসেল, শেলী ও কীটসসহ বেশ কয়েকখানা বই। এর মধ্যে কয়েকটা বইয়ে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয় তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলিতে ছিল।

মা, এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলি এনেছেন কিনা। যদিও আব্বাকে অনেক বই জেলে পাঠানো হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউমার্কেটে মা'র সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সবসময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলো ওরা নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ বইগুলির জন্যে। ঐতিহাসিক দলিল হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তা সবই হারালাম।

১৯৮১ সালে আমি ফিরে এসে বাড়িটি খুলে দিতে বলি; কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমতি দেয়নি। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতিও পাইনি। মিলাদ পড়ানোর জন্যেও বাড়ির দরজা খুলে দেয়নি জিয়া। রাস্তার ওপর বসেই আমরা মিলাদ পড়ি।

জেনারেল জিয়া সরকারের পক্ষ থেকেই আমাকে থাকার জন্যে বাড়ি দেবার প্রস্তাব পাঠানো হয়। আমি একজন স্বৈরাচারের হাত থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করি। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে, প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবারকে একটি বাড়ি, একটি ফোন, ভাতা, গাড়ি ইত্যাদি কিছু সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। (যেমন, জেনারেল এরশাদ সরকারের কাছ থেকে জিয়ার স্ত্রী ও পরিবার গ্রহণ করতেন) আমরা কোনোদিনই কোনোকিছু গ্রহণ করিনি।

জেনারেল জিয়া নিহত হবার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার এই বাড়ির দরজা খুলে দেন। দেশে যখন আবার মার্শাল ল' জারি হয়, এই বাড়িটি বিরোধী দলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। যদিও দোতলা বা সিঁড়ি আমরা ব্যবহার করিনি কখনো, কেবলমাত্র বসার ঘর আর লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করেছি, মিটিং করেছি। অনেক জরুরি পরিস্থিতিতে বহু মিটিং হয়েছে এখানে। ১৯৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ বহু ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেছে।

আবার ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর আমাকে গ্রেফতার করে এই বাড়িতে আনা হয়। ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন পর্যন্ত এই বাড়িতে গৃহবন্দি হিসেবে অবস্থান করে আমরা রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের সব কাজ এই বাড়িতে বসে করি।

এ বাড়িটি যখন ১৯৮১ সালের ১২ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেওয়া হলো, তখন বাড়িটির গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ঝুল, ধুলোবালি, পোকা-মাকড়ে ভরা। ঘরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলি-কাচ ভাঙা, বইগুলো বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভেতরে এখনো বুলেট রয়েছে। একটা বইয়ের নাম ছিল 'শ্রদ্ধাঞ্জলী,' বইটির উপরে কবি নজরুলের ছবি। বইটির ভিতরে একখানা আলগা ছবি একজন মুক্তিযোদ্ধার, বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষত-বিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের ওপর গুলি। ঠিক ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয় তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। এ বইটির দিকে তাকালে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়'।[২১]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক-সাংবাদিক রবার্ট পেইনের লেখায়ও রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির প্রসঙ্গ। তার লেখায় পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার জর্জ বার্নাড শ, বাট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি, বুকসেলফে বাঁধাই মাও সেতুংরে স্বাক্ষরিত ছবির উল্লেখ।[২২]

শুধু ব্যক্তিগত লাইব্রেরি নয়, বঙ্গবন্ধুর পাঠস্পৃহা এবং বইপ্রীতির নিদর্শন ছিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস পর্যন্ত। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছিল কয়েক হাজার বইসমৃদ্ধ পাঠাগার। এই পাঠাগারে দেশীয় গ্রন্থ ছাড়াও ছিল জার্মানি, বুলগেরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত বই। এই পাঠাগার খোলা থাকত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।[২৩]

দলীয় কার্যালয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল দলীয় কর্মীদের পাঠ-মনস্কের মাধ্যমে রাজনীতি-ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা।

বইয়ের বন্ধু বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর বইপড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে আরো গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। বঙ্গবন্ধু যেমন বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন, তেমনি তিনি নিজেও 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' নামের বই লিখে বাঙালি তথা বিশ্বপাঠকের কাছে রেখে গেছেন একজন প্রথম শ্রেণির লেখকের নিদর্শন। বই পড়ে যেমন বঙ্গবন্ধু নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন, অপরকে বই পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন তেমনি নিজেও বই লিখে মনন ও সৃজন রাজ্যে রেখে গেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক দীপ্ত আলোর শিখা।

সহায়ক তথ্যসূত্র

১. বেবী মওদুদ, শেখ মুজিবের ছেলেবেলা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১১, ১৩ ও ২৭।
২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
১৫. উদ্ধৃত, ড. মোহাম্মদ হান্নান, মানিক মিয়াকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চারটি ঐতিহাসিক চিঠি, শাহ আলমগীর সম্পাদিত 'নিরীক্ষা', পিআইবি, জুলাই-আগস্ট, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ৪১-৪২।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
১৭. শওকত ওসমান, কাছে থেকে দূরে, দূর থেকে কাছে শেখ মুজিব, নূহ উল আলম লেনিন সম্পাদিত 'ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৩০।
১৮. নীলিমা ইব্রাহীম, কৃষ্ণান্ধকার, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭১।
১৯. আবীর আহাদের সাক্ষাৎকার, বিজয়নগর, ঢাকা তাং-২৮.০১.২০১৬।
২০. মোশাররফ হোসেন, আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে বাণী ১৯৭২, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু কোষ', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪১।
২১. শেখ হাসিনা, স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু', ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯৭-৯৮।
২২. উদ্ধৃত, শহীদুল হক খান, বঙ্গবন্ধু সকলের, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫০।
২৩. প্রাগুক্ত।

লেখক: গবেষক

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন রাষ্ট্র ভাবনা ও বহির্বিশ্ব সম্পর্ক

শামীমা চৌধুরী

দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে আজ লাল-সবুজের যে পতাকা ওড়ছে, তার পেছনে আছে বাঙালি জাতির শত বছরের সংগ্রাম, আন্দোলন আর রক্তক্ষয়ী লড়াই। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিল এই লড়াই। এ লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, প্রিয়জন হারানোর বেদনা আর মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, এক সাগর রক্ত পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতার মূল নায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের এই অগ্নিপুরুষ দীর্ঘ ২৩ বছর নিরবচ্ছিন্ন-নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে সংগঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার যে প্রেক্ষিত তৈরি হয়, তা হঠাৎ করে আসেনি। একটি নৃগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি জাতির জন্ম ও গড়ে ওঠা কয়েকশ' বছর আগে। অভিন্ন ভাষা, আর্থ-সামাজিক জীবনধারা, শারীরিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক গড়নের অভিন্নতা নিয়েই এই জাতি ধীরে ধীরে একটি উন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রবিধৌত পলিমাটির দেশের এই জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন এই অঞ্চলের প্রায় দক্ষিণঘেঁষা সবুজ, শান্ত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া 'মুজিব' নামের এই মহিরুহ।

বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন প্রাধান্য পায় তাঁর সংগ্রামী জীবন, জেলজীবন, রাজনৈতিক জীবন। এর বাইরে মাত্র তিন বছরের দেশ পরিচালনায় তাঁর সাফল্য রাজনৈতিক জীবনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আউল-বাউল সাধক, ভাবুকদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই ভূখণ্ডটিকে কীভাবে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে পরিণত করা যায়, প্রতিবেশী ও বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সময়ের দাবি নিয়ে কীভাবে দেশটি টিকে থাকবে তাঁর এই ভাবনা প্রাধান্য পায় তাঁর শাসনভার গ্রহণের শুরুতেই।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে আসার পর দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর বঙ্গবন্ধু যে ক'টি কাজ প্রথমেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো:

১. ভারতের সেনাবাহিনী ফেরত
২. বঙ্গোপসাগরকে মাইনমুক্ত করা
৩. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন
৪. দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন
৫. খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সবুজ বিপ্লব
৬. বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি।

১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ঢাকায় প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা দেন– 'বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে আমি গড়ে তুলব।'

প্রখ্যাত সাংবাদিক-লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের আইডিয়াটা কীভাবে আপনার মাথায় এসেছিল?' উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'শুনবেন?' তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারত। তারা জগৎ জয় করতে পারত। They Could conquer the world.'

এ কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বলেন, 'দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাঁদের প্রস্তাবে। তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে, আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে শুরু করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে, এটাই ছিল আমার চিন্তা। কিন্তু এই চিন্তা বাস্তবায়ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। কিছু কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি যা কমিউনাল! বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে পাক বাংলা। কেউ বলে, পূর্ববাংলা। আমি বলি, না, বাংলাদেশ। তাই আমি স্লোগান দিই, জয় বাংলা। তখন ওরা বিদ্রূপ করে বলত, জয় বাংলা না জয় মা কালী। কী অপমান। সে অপমান আমি সেদিন হজম করেছি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয়। যা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।' (সূত্র: অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, সম্পাদনায় আসলাম সানী/নাঈম নোমান, পৃ. ৩০)।

বঙ্গবন্ধুর এ কথায় প্রমাণিত, বঙ্গবন্ধু ২৩ বছর শুধু বাঙালির স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে লড়াই করেননি, তাঁর মনের কোটরে লুকিয়ে ছিল 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। সেই সঙ্গে সেই দেশটির টিকে থাকার স্বপ্ন।

ক্ষমতায় আসীন হয়ে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার উদ্যোগ নেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ১৯৭১ সালে চাকরিরত অবস্থায় পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেন। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে তৎপর হন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁকে নিয়োগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রশাসনিক দূরদৃষ্টিতার প্রমাণ দেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। কিন্তু বাংলাদেশ যে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, এ দেশের মানুষের ইতিহাসের প্রবাহে যে একটি স্বকীয়তা রয়েছে, এই চিন্তাটি শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতি এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছিল। সেই সময়ে ইসলামী সংস্থায় বাংলাদেশের যোগদানের এ একটি কারণ। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নের ব্যাপারেও আগ্রহ তাঁর ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় চীন এবং সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুই দেশের সঙ্গেই অনানুষ্ঠানিকভাবে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বের অবদানের কথা ভারতের এক সময়ের পররাষ্ট্র সচিব ও পরবর্তীতে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত তাঁর 'Liberation and Beyond' বইটিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর কলকাতা সফর এবং সেখানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ, ভারতের সেই সময়ের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরার কংগ্রেস দলের জন্য সহায়ক ছিল। বঙ্গবন্ধু দক্ষিণ এশিয়ার একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিলেন এবং একটি ক্ষুদ্রতর দেশের রাষ্ট্রনায়ক হয়েও তিনি ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখতেন তা ছিল কোনো পাকিস্তানি নেতার চিন্তারও বাইরে।

সেই প্রভাবের একটি নজির হলো অসুস্থ জাতীয় কবি নজরুলকে ১৯৭২ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর এই অবদানটি চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

মাত্র তিনটি বছরে বঙ্গবন্ধু বেশ ক'টি আন্তর্জাতিক এবং বহুপাক্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের আগস্টে কানাডার অটোয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলন, সেই বছরেরই সেপ্টেম্বরে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন, সেই বছরের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আর ১৯৭৫-এর মে মাসের জ্যামাইকার কিংসটানের কমনওয়েলথ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু রেখেছিলেন তাঁর উপস্থিতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর, পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে (ওআইসি) যোগ দেওয়ার জন্য সাতটি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানান, আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে তারপর তিনি ওআইসিতে যোগ দেবেন। বাস্তবে তাই-ই হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে দ্ব্যর্থ ভাষায় জাতিসংঘের স্বপক্ষে জয়গান গান। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ বা ন্যাম সংস্থা অন্যতম নেতৃস্থানীয় দেশ। ১৩৩ দেশের সমন্বয়ে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার এশিয়া-প্যাসিফিক রাষ্ট্রগুলোর ভাগে আসে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ঢাকায় ন্যাম সম্মেলন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং কনভেনশন সেন্টারও তৈরি হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায়ই বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ করেন পারস্পরিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে। পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সময়কার বিরূপ অবস্থার মধ্যেও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করেন। বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফর আর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকা সফর সূচনা করেছিল দুই দেশের মাঝে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তি।

ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনটি বছরের মধ্যে তিনি যেমন বিভিন্ন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। সেসময় বিশ্বের প্রতিনিধিদের মাঝে বাংলাদেশে এসেছিলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বোমেদিন, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড অনগব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ নেতা। জাপান থেকে এসেছিল ৪৫ সদস্যের সুবৃহৎ একটি অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন বেশ ক'টি দ্বিপাক্ষিক সফরে। বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশ পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে আসা, যুদ্ধোত্তর একটি দেশের পুনর্গঠনে নাভিশ্বাস ওঠা রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই প্রতিষ্ঠা লাভ বঙ্গবন্ধু দূরদৃষ্টিতার ফসল।

বঙ্গবন্ধু যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন এর ভেতরেই রয়েছে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবতা। *'সবার প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়'*–বঙ্গবন্ধুর এই অমর বাক্যই ছিল তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল শক্তি। দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারের মূলমন্ত্র এটি। জাতির জনক গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে এবং পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বলিষ্ঠ বহুপাক্ষিক মাত্রা সংযোগের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপত্তা ও জাতীয় বলিষ্ঠ ভাবমূর্তিসহ বাংলাদেশের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। বিশ্ব তখন দুই ভাগে বিভক্ত। গণতান্ত্রিক বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই পরাশক্তির লড়াই যখন তুঙ্গে, বঙ্গবন্ধু তখনই এমন এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে আদর্শগত ভেদাভেদ ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কামুক্ত পরিবেশে মানবজাতির যৌথ কল্যাণে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী সহাবস্থান করবে।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে তিনি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে শান্তি ছাড়া পথ নেই। এটিই হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী মানবীয় গভীরতম আকাঙ্ক্ষা'। তাঁর নির্দেশনায় প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ঐক্য প্রসারের প্রতি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গীকার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ সুস্পষ্ট ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, বাংলাদেশ কেবল শান্তির জন্যই শান্তি চায় না, বরং এর পেছনে রয়েছে উন্নয়ন ও নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সংগ্রাম করার দৃঢ় প্রত্যয় শুধু ঘোষণা করেননি, তার সঙ্গে সকল দেশকে একত্রিত হয়ে তা দূর করতে আহ্বান জানান।আজ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচালনায় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে এবং গত বছরে জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সম্মতিতে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বিশ্ব থেকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য যে ১৭টি টেকসই লক্ষ্যমাত্রা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার শান্তিরক্ষী নিয়োজিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে 'শান্তির দূত' হিসেবে সমধিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে জাতিসংঘের সমঝোতায় কোনো প্রকার যুদ্ধ বা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আইনের মাধ্যমে সমুদ্রসীমার সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে। ৬৫ বছরের অমীমাংসিত বেরুবাড়িসহ সীমান্ত ছিটমহলগুলোর হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করেছে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের মধ্যে ট্রানজিট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটিত হচ্ছে। আজ বাংলাদেশ ভারত ও নেপাল এবং ভারত ও ভুটানের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব গভীর ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে মডারেটরের ভূমিকা পালন করছে।

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে ৬৩ হাজার পাকিস্তানি পরিবারকে পাকিস্তানে নিয়ে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি তোলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি বলেন, আরও একটি জরুরি সমস্যা হলো সাবেক পাকিস্তানের সম্পদ বণ্টন। তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হবে, যাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হতে পারে। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখবে।

(সূত্র : অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, সম্পাদনায় আসলাম সানী/নাঈম নোমান, পৃ. ৩০)

জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির বৈধ অধিকারের প্রেক্ষাপটে ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা (১৯৭১-এর ২৫ মার্চে পাকি দখলদারদের সশস্ত্র আক্রমণের পরপরই)। কারারুদ্ধ অবস্থাতেও নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে তাঁরই চেতনার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। গোটা এশিয়ায় বিশেষ করে ধর্মপ্রবণ ও শিক্ষাদীক্ষাহীন দরিদ্রপীড়িত দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নজির ইতিহাসে বিরল। এদিকে লক্ষ্য রেখেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার তাত্ত্বিক অস্টিন ডেইসি (Austin Dacey) বলেছিলেন: 'Thomas Jefferson could have learned a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman' (The Daily Star, March 17, 2006)

মাত্র ৪৪ মাস দেশের শাসনভার পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করে গেছেন সেই আলোয় আজও পথ চলছে বাংলাদেশ। চলবে পৃথিবী যতদিন আছে ততদিন।

তথ্যসূত্র

১. সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, বঙ্গবন্ধুই পররাষ্ট্রনীতির স্থপতি, গ্রন্থ ১৫ আগস্ট জাতির শোকগাথা, পৃ. ৫৯
২. শামসুজ্জামান খান, বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান বাংলাদেশ ,পৃ. ১০, বিজয় প্রকাশ।
৩. The Daily Star, March 17, 2006।
৪. অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, সম্পাদনায় আসলাম সানী/নাঈম নোমান, পৃ. ৩০।
৫. ফারুক চৌধুরী,বঙ্গবন্ধু,পৃ. ৩৭।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী/গবেষক

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

অবিস্মরণীয় দৈনিক পূর্বদেশ এবং বঙ্গবন্ধু

শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম দৈনিক পূর্বদেশ। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি আমলে শুধু অবহেলিত গণমানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য মাহবুবুল হক ফেনী থেকে বের করেছিলেন সাপ্তাহিক *পল্লীবার্তা*। মানুষের পক্ষে কথা বললে এবং নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে যে একটি সংবাদপত্র জনগণের কাছে তার দায়বদ্ধতা পূরণ করতে গিয়ে ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে পারে, *সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা* এবং এ থেকে রূপান্তরিত *সাপ্তাহিক পূর্বদেশই* তার একটি বড়ো প্রমাণ। সাংবাদিক-রাজনীতিক মাহবুবুল হকের *পূর্বদেশ* সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পেছনের ইতিহাস দেশ ও জনগণের প্রতি সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার প্রতি সেই আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কথা মাহবুবুল হক নিজেই লিখেছিলেন *দৈনিক পূর্বদেশ*-এর ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট সংখ্যায় 'পূর্বদেশের পূর্বকথা' শীর্ষক শিরোনামে:

দৈনিক হিসেবে *পূর্বদেশের* আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে আজ কত কথাই না মনে পড়ছে। সে স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে গোটা জাতীয় জীবনের প্রায় চৌদ্দ বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা-সংশয়, ষড়যন্ত্র, বঞ্চনা, ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাস শুধু মানসপটেই নয়, কালির অক্ষরে কাগজের পাতায়

লেখা রয়েছে– যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে *দৈনিক পূর্বদেশ*র পূর্বসূরি *সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা* এবং তারপরের *সাপ্তাহিক পূর্বদেশে*'র সাপ্তাহিক অস্তিত্বের চৌদ্দটি বছর।

যে উদ্দেশ্যে এবং যাদের জন্য *সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা*র আত্মপ্রকাশ, গ্রামবাংলার সেই অগণিত মানুষের কাছ থেকে সাড়া পেতে দেরি হলো না। *পল্লীবার্তা* পল্লীবাসীর মন জয় করতে সমর্থ হলো। তখন আমরা উপলব্ধি করলাম, পূর্ববাংলার ষাট হাজার গ্রামে *পল্লীবার্তা*'র বাণী পৌঁছে দিতে হলে ফেনীর ছোট্ট শহর থেকে তা সম্ভব নয়। একটি আধুনিক ও উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে ছাপাখানা থেকে শুরু আরও যেসব সাজসরঞ্জাম ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন, তা কেবলমাত্র রাজধানী শহরের পক্ষেই সম্ভব। তখন সব দিক বিবেচনা করে পত্রিকাটিকে ঢাকা থেকে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পরেই এলো *পল্লীবার্তা*র আরেকটি রূপান্তর পর্ব। এরও সম্পর্ক রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনের ক্রম-রূপান্তরের সঙ্গে। *পল্লীবার্তা*র প্রসার, জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করলাম যে, গোটা দেশ, বিশেষ করে বাংলার সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করতে হলে তাদের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের অংশভাগী হতে হলে পত্রিকাটিকেও ব্যাপকভিত্তিক করা দরকার এবং তার নামের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিফলন হওয়া প্রয়োজন। তাই *পল্লীবার্তা*র প্রকৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও রূপান্তর ঘটলো *পূর্বদেশ*– এ *সাপ্তাহিক পূর্বদেশ*। উদয় গগণের আলোকিত পথের শপথ রইল তার মনে।[১]

মুক্তিযুদ্ধকালে পরিস্থিতির শিকার হয়ে পাকিস্তানপন্থি মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার হাউস থেকে প্রকাশিত হয় *দৈনিক পূর্বদেশ*।

কিন্তু এর মালিক ও সম্পাদক মাহবুবুল হক (মৃত্যু: ৫ জুন ১৯৭৪) বাংলাদেশ ও এর জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'পূর্বদেশ' দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৭০ সালে এবং দেশের অন্যতম জনপ্রিয় দৈনিকে পরিণত হয়েছিল। প্রখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান মাহবুবুল হক এমনই একজন সাংবাদিক, যিনি যথার্থ অর্থেই দেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, যা তিনি তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন।

২০১১ সালের ৪ জুন জাতীয় প্রেস ক্লাবে তাঁর স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন–

'অকুতোভয়, সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল সর্বত্র। সংবাদপত্রে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো আপস করেননি তিনি। বর্তমানে সাংবাদিকদের উচিত মাহবুবুল হকের মতো সাংবাদিকতার আদর্শ অনুসরণ করা। তবেই দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। মাহবুবুল হক বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মানদণ্ডের কথা বলতেন। সাংবাদিকতায় তার যে দক্ষতা ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কারো ছিল না। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। বর্তমান সময়ে তাঁর মতো নির্ভীক ও নীতিবান সাংবাদিকের বড়ো অভাব' –তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ।

'একাধারে রাজনীতিক, ভাষাসৈনিক, সাংবাদিক ও দক্ষ সংগঠক মাহবুবুল হকের এত গুণ তাকে অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতের তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। সংগঠক হিসেবে যেমন, তেমনি সংবাদপত্র প্রকাশনা, সংবাদকর্মী তৈরিতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৫৬ সালে ফেনী থেকে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা। পল্লীবার্তা রূপান্তরিত হয় সাপ্তাহিক পূর্বদেশে। ১৯৬৯ সালে পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। গণমুখী পত্রিকা হিসেবে দৈনিক পূর্বদেশ বাঙালিদের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে' – এ বি এম মূসা।

'অতীতে যারা আমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন, তাঁদের কথা আমরা বলি না বা বলতে চাই না। মাহবুব ভাইয়ের যে জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, সময়ই তাকে সে জায়গায় নিয়ে যাবে' – কামাল লোহানী

'মাহবুবুল হক মানুষকে ভালোবাসতেন, মাটির কাছাকাছি থাকতেন। সব মত-পথের মানুষকে এক করেছিলেন তিনি' –ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী।

'তৎকালীন পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব অংশের মধ্যে যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য ছিল, তা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ জনগণের সামনে তুলে ধরে তিনি স্বাধিকার আন্দোলনের অনেক সোপান নির্মাণ করেছিলেন। মাহবুবুল হক প্রতিষ্ঠিত পূর্বদেশ পত্রিকা থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংবাদিক স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করেছিলেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি মাহবুবুল হকের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অবদান এদেশের শ্রমজীবী মানুষ আজীবন মনে রাখবে। তিনি প্রধানত রেলশ্রমিকদের সংগঠিত করে ন্যায্য দাবি ছাড়াও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। বর্তমান সাংবাদিকদের উচিত মাহবুবুল হকের মতো সাংবাদিকতার আদর্শ অনুসরণ করা। তবেই দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। দেশ ও জাতি উপকৃত হবে' –আতাউস সামাদ।[২]

দৈনিক পূর্বদেশ নামটির সঙ্গে আরও যে কটি নাম জড়িয়ে আছে, এমন অনেক খ্যাতিমান সাংবাদিকদের মধ্যে বিশিষ্ট ছড়াকার এবং ছোটদের জনপ্রিয় পাতা 'চাঁদের হাট'-এর সম্পাদক রফিকুল হক দাদুভাই এবং 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী অন্যতম। তাঁরা ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণমানুষ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী। গণমানুষের স্বার্থে নিবেদিত এই পত্রিকার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক কেমন হতে পারে, তা সচেতন যে কেউই আঁচ করতে পারেন। এ সম্পর্কে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন, ১৯৬৯ সালের ৩০ মে অবজারভার হাউস থেকে পূর্বদেশ দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। আমি দৈনিকটির সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিই। রফিক এর শিফ্‌ট-ইনচার্জের দায়িত্ব পায়। বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পান ইত্তেফাকের এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। রফিকুল হকের বাড়তি দায়িত্ব ছিল কাগজটির ছোটদের পাতা 'চাঁদের হাট' সম্পাদনা করা। 'দাদুভাই' ছদ্মনামে সে পাতাটি সম্পাদনা করত। কিছুদিনের মধ্যে 'চাঁদের হাট' পাতাটিকে কেন্দ্র করে একটি শিশু সংগঠনও গড়ে উঠে। ইত্তেফাকের শিশুদের পাতার নাম ছিল 'কচিকাচার আসর'। এর পরিচালক রোকনজ্জামান খানের নাম ছিল দাদাভাই। দাদাভাই ও দাদুভাই এ দুটি নাম তখন ছোটদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠে।[৩]

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় 'গর্কি'র আঘাতে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। এদেশের মানুষ ও উপকূলীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় জেনারেল ইয়াহিয়ার পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি, যা এদেশের সচেতন মানুষকে হতবাক করে দেয়। ঝড়ের এক দিন পর রফিকুল হক দাদুভাইয়ের গর্কি নামের একটি ছড়া ছাপা হয় দৈনিক পূর্বদেশ-এর সম্পাদকীয় পাতায়। ছড়াটি সারা দেশে এমন কী ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও আলোড়ন তুলে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন, 'কলকাতার বেতার কেন্দ্র আকাশবাণীর 'সংবাদ পরিক্রমা' অনুষ্ঠান থেকে ছড়াটি সম্প্রচারিত হয়। প্রখ্যাত বাচিকশিল্পী দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় ওই ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার বিবরণ দিতে গিয়ে ভরাট গলায় ছড়াটি পাঠ করেন। ছড়াটি সম্ভবত এরকম ছিল:

ছেলে ঘুমোলো বুড়ো ঘুমোলো
ভোলা দ্বীপের চরে
জেগে থাকা মানুষগুলো
মাতম শুধু করে।
ঘুমো বাছা ঘুমো রে
সাগর দিল চুমো রে
খিদে ফুরোলো, জ্বালা জুড়োলো
কান্না কেন ছি,
বাংলাদেশের মানুষ বুকে
পাষাণ বেঁধেছি'।[৪]

দৈনিক পূর্বদেশ-এ প্রকাশিত এ ছড়াটিতে পূর্ব পাকিস্তান নামটির পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' শব্দটির ব্যবহার করা হয়। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে 'বাংলাদেশের মানুষ'-এর মতো শব্দ দুটির ব্যবহার অত্যন্ত কঠিন ছিল। একটি দৈনিকে এ অঞ্চলের মানুষের একটি বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে এমন শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পূর্বদেশ এবং এর সাংবাদিকরা বাঙালি জাতীয়তাবোধ তথা জাতীয়তাবাদের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দৈনিক পূর্বদেশ এবং দাদুভাইয়ের কী রকম আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, তার একটি চিত্র পাওয়া যায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর এই লেখায়–

'বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কিছু দিনের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে

সুচিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় এক মাস চিকিৎসা নিয়ে আরোগ্যলাভের পর একই বছর ১৪ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরেন। তাঁর দেশে ফেরা উপলক্ষে পূর্বদেশ একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে, যার নামকরণ হয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা রফিকের একটি ছড়ার শিরোনাম দিয়ে। ছড়াটি পূর্বদেশ-এর সেই বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে ছাপা হয় বঙ্গবন্ধুর একটি বড়ো ছবির নিচে। ছড়াটি ছিল:

ঘরে ফিরা আইসো বন্ধু
পাইতা থুইছি পিড়া,
জলপান যে করতে দেব
ইরি ধানের চিড়া।
শালি ধানের চিড়া ছিল
বিন্নি ধানের খই,
কোথায় পাবো সবরিকলা
গামছা বাঁধা দই!
জান মেরেছে খান পশুরা
বর্গী সেজে ফের আগুন জ্বেলে খাক করেছে
দেশটা আমাদের।
প্রাণের বন্ধু ঘরে আইলা
বসতে দিমু কিসে;
বুকের মধ্যে তোমার বাণী
রক্তে আছে মিশে।
বঙ্গবন্ধু তোমার আসন
বাংলাদেশের মাটি
মনের মধ্যে পাতা আছে
প্রীতির শীতল পাটি'।[৫]

এভাবেই বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তানি হানাদারদের নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ এবং এই ধ্বংসযজ্ঞের ওপর উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভোর একটি জনগোষ্ঠী হৃদস্পন্দন পাওয়া যায় দৈনিক পূর্বদেশ এবং এর সাংবাদিকদের কর্ম ও চিন্তায়।

তথ্যসূত্র

১. নিরীক্ষা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ১৯৯৪, পঁয়ষট্টিতম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২২-২৩।
২. দৈনিক আমার দেশ, ৫ জুন ২০১১।
৩. হাসিতে হাসিতে আশিতে, রফিকুল হক দাদুভাইয়ের ৮০তম জন্মদিন স্মরণিকা, ৮ জানুয়ারি, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৪।
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

লেখক: রিচার্স অফিসার, পিআইবি

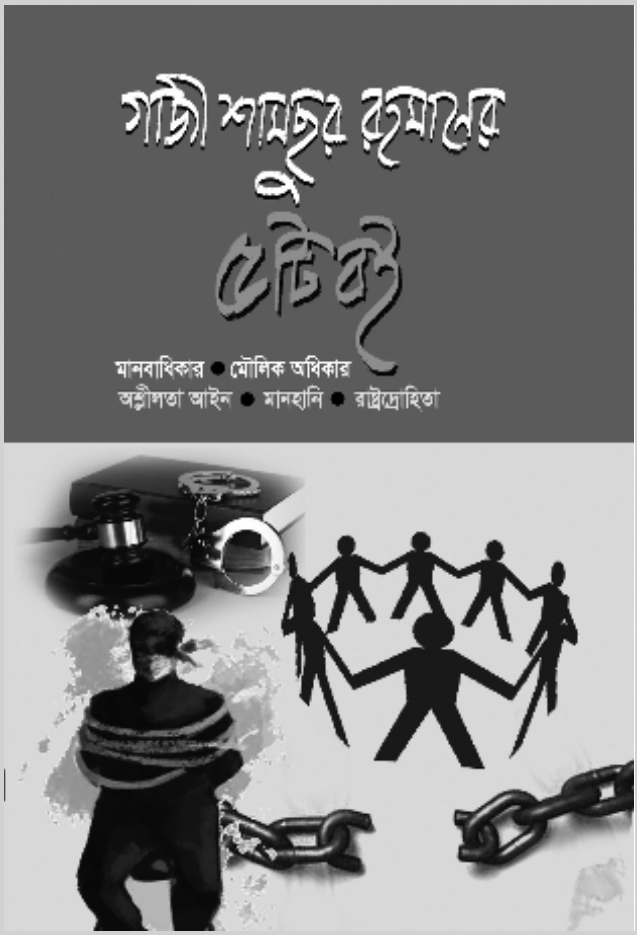

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর কলকাতা স্মৃতি

ড. শিল্পী ভদ্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ ১৯২০ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব– যিনি বাঙালির অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশ-ভারত থেকে ভারত বিভাজন আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেন। প্রাচীন বাঙালি সভ্যতার আধুনিক স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের 'জাতির জনক' বা 'জাতির পিতা' বলা হয়ে থাকে। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীকালে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি শেখ মুজিব এবং শেখ সাহেব হিসেবে বেশি পরিচিত এবং তাঁর উপাধি 'বঙ্গবন্ধু'।

তিনি ১৯২০, ১৭ই মার্চ, তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই তাঁর ছোট দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। চতুর্থ শ্রেণিতে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩৪-'৩৬ সালে বেরিবেরি রোগ এবং চোখের গ্লুকোমার কারণে খেলাধুলা, গান, ব্রতচারী করা দুষ্টু ছেলেটির জীবনের পটপরিবর্তন হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালে কলকাতা থেকে

চোখের চিকিৎসা শেষে মাদারীপুর ফিরে আসার পরই তাঁর জীবনে রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর ভাষ্যে–

'চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুর ফিরে এলাম, কোন কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনের-ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম'[১]

বঙ্গবন্ধুর সেবা-সংগঠনমূলক কাজের সূত্রপাত হয় ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময়। তখন তার গৃহশিক্ষক ছিলেন কাজী আবদুল হামিদ সাহেব। তাঁর একটা 'মুসলিম সেবা সমিতি' ছিল। তিনি মুসলমানদের প্রত্যেক বাড়ি থেকে মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠিয়ে গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। শেখ মুজিব অন্যদের সাথে মিলে প্রতি রবিবার চাল ওঠানোর কাজে শিক্ষককে সাহায্য করতেন। তিনি জায়গির ঠিক করা এবং শিক্ষকের অন্যান্য কাজও করে দিতেন। তবে তিনি হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে মারা গেলে বঙ্গবন্ধু সেবা সমিতির ভার নেন এবং অনেকদিন সেবা সমিতিটি পরিচালনা করেন–

'হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিতির ভার নিই এবং অনেকদিন পরিচালনা করি। আর একজন মুসলমান মাস্টার সাহেবের কাছেই টাকাপয়সা জমা রাখা হত। তিনি সভাপতি ছিলেন আর আমি ছিলাম সম্পাদক'[২]

এই সেবা-সংগঠনমূলক কাজ এবং খেলাধুলা বিশেষত ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলায় বঙ্গবন্ধুর ঝোঁক ছিল তখনো রাজনীতির ঝোঁক তার মাথায় আসেনি–

'ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভাল অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না'[৩]

তবে বলা যায়, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে ১৯৩৮ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরিচয় এবং কথোপকথনকে কেন্দ্র করে।

১৯৩৮ সালে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে এক্সিবিশন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শেরেবাংলা (তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী) এবং সোহরাওয়ার্দী (তৎকালীন বাংলার শ্রমমন্ত্রী) একসাথে আসেন। তাঁদের আগমন উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু তখন মিশন স্কুলের ছাত্র এবং অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার দায়িত্বে ছিলেন। এর নেতৃত্বও দেন তিনি। এক্সিবিশন উদ্বোধন শেষে ফজলুল হক পাবলিক হল পরিদর্শনে যান। অন্যদিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী এলেন তাঁরই স্কুল পরিদর্শনে। বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়ার সুযোগ পান। এই স্কুল পরিদর্শন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে– যা পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং সমগ্র জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আবার বলা যেতে পারে, সৌভাগ্যপ্রসূত-ঘটা এই পরিচয়ের মধ্যেই শেখ মুজিবের পরবর্তী জীবন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিহিত ছিল। তাঁর ছাত্র রাজনীতি এবং মূল রাজনীতির 'গুরু'ও ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুল পরিদর্শন শেষে শহীদ সাহেব ফিরে যাওয়ার পথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

'তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারি কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, 'তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?' বললাম, 'কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম লীগও নাই'। তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম'[৪]

দ্বিতীয়বার তিনি ১৯৩৯ সালে কলকাতায় গিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগ গঠন করার বিষয়ে তিনি শহীদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাকে এবং ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক সাহেবকে গোপালগঞ্জে আসতে অনুরোধ করেন। এ সময় সোহরাওয়ার্দী তাঁকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করেন। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তাঁর ভাষ্যে–

'শহীদ সাহেবকে বললাম, গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করব এবং মুসলিম লীগও গঠন করব। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব এমএলএ তখন মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। তিনি সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের। আমি হলাম সম্পাদক। মুসলিম লীগ গঠন হল। একজন মোক্তার সাহেব সেক্রেটারি হলেন, অবশ্য আমিই কাজ করতাম। মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি একটা গঠন করা হল। আমাকে তার সেক্রেটারি করা হল। আমি আস্তে আস্তে রাজনীতিতে প্রবেশ করলাম'[৫]

১৯৪২ সালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর পড়তে চলে যান কলকাতায়। এই সালেই তিনি ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ) ইন্টারমিডিয়েটে, কলা বিভাগে। এই সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর কলকাতা বসবাস শুরু হলেও তাঁর পূর্বপুরুষদেরও রয়েছে কলকাতাকে ঘিরে নানা স্মৃতি, তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন:

"কলকাতার একটা সম্পত্তি ও উল্টাডাঙ্গার আড়ত শেখদের সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন শেখ অছিমুদ্দিন'[৬]

তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের কলকাতার সম্পত্তি শেষ হয়ে যাবার প্রসঙ্গে বলেছেন:

'আমার দাদার চাচা এবং রেণুর দাদার বাবা কলকাতা থেকে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসেন বাড়িতে। কলকাতার সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন সকলে গ্রেফতার হয়ে গেছে, কেউই দেখার নাই – বড় বড় ব্যবসায়ী, মাঝি ও ব্যাপারীরা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে উধাও হতে শুরু করল। এর পূর্বে তমিজুদ্দিনের খুনে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়ে গেছে। জমিদারিও নিলাম হয়ে প্রায় সবই চলে যেতে লাগল। বহুদিন পর্যন্ত মামলা চলল। নিচের কোর্টে সকলেরই জেল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু হল। আমাদের এডভোকেট হাইকোর্টে দরখাস্ত করল সিআইডি দ্বারা মামলা আবার ইনকোয়ারি করাতে। কারণ এ মামলা ষড়যন্ত্রমূলক। হাইকোর্ট মামলা দেখে সন্দেহ হলে আবার ইনকোয়ারি শুরু হল। একজন অফিসার পাগল সেজে আমাদের গ্রামে যায় আর খোঁজখবর নেয়। একদিন রাতে সেরাজতুল্লাহ কাজীর তিন ছেলের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয় এবং কথায় কথায় এক ভাই অন্য ভাইকে বলে, 'বলেছিলাম না শেখদের কিছু হবেনা, বাবাকে অমনভাবে মারা উচিৎ হবেনা।' অন্য ভাই বলে তুই তো গলাটিপে ধরেছিলি তাই তো বাবা মারা গেল।' বোনটা বলল 'বাবা একটু পানি খেতে চেয়েছিল, তুই তো তাও দিতে দিলিনা' সিআইডি এই কথা শুনতে পেল ওদের বাড়ির পিছনে পালিয়ে থেকে। তার কয়েকদিন পরেই তিন ভাই ও বোন গ্রেফতার হল এবং স্বীকার করতে বাধ্য হল তারাই তাদের বাবাকে হত্যা করেছে।

শেখরা মুক্তি পেল আর ওদের যাবজ্জীবন জেল হল। শেখরা মামলা থেকে বাঁচল; কিন্তু সর্বশান্ত হয়েই বাঁচল। ব্যবসা নাই, জমিদারি শেষ, সামান্য তালুক ও খাস জমি, শেখ বংশ বেঁচে রইল শুধু খাস জমির জন্য। এদের বেশকিছু খাস জমি ছিল। আর বাড়ির আশপাশ দিয়ে কিছু জমি নিষ্কর ছিল'[৭]

এরপর বঙ্গবন্ধু ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াতে তার চিকিৎসা হয় কলকাতাতেই–

'১৯৩৪ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্বা আমাকে নিয়ে কলকাতা চিকিৎসা করাতে যান। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরী আরও অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা করাতে থাকেন। প্রায় দুই বছর আমার এইভাবে চলল'[৮]

এরপর ১৯৩৬ সালে তাঁর চোখে গ্লুকোমা রোগ ধরা পড়ে তখন ডাক্তারদের পরামর্শে চিকিৎসার জন্য বাবা আবার তাকে কলকাতা নিয়ে যান–

'কলকাতা যেয়ে ডাক্তার টি.আহমেদ সাহেবকে দেখালাম। আমার বোন কলকাতায় থাকত, কারণ ভগ্নিপতি এজিবিতে চাকরি করতেন। তিনি আমার মেজোবোন শেখ ফজলুল হক মণির মা। মণির বাবা পূর্ব সম্পর্কে আমার দাদা হতেন। তিনিও শেখ বংশের লোক। বোনের কাছেই থাকতাম। কোন অসুবিধা হত না। ডাক্তার সাহেব আমার চক্ষু অপারেশন করাতে বললেন। দেরি করলে আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি। আমাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। ভোর ন'টায় অপারেশন হবে। আমি ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করতে লাগলাম; কিন্তু পারলাম না। আমাকে অপারেশন ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দশ দিনের মধ্যে দুইটা চক্ষুই অপারেশন করা হল। আমি ভাল হলাম। তবে কিছুদিন লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হবে। তাই ১৯৩৬ সাল থেকেই চশমা পড়ছি'[৯]

তাঁর কলকাতা স্মৃতিচারণে জানা যায় আরেকটি ঘটনা–

'যেদিন আমি ম্যাট্রিক পাস করে ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যাই আমার আব্বাও সেইদিন পেনশন নিয়ে বাড়ি চলে যান'[১০]

১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও তিনি প্রকৃত রাজনীতির পাঠ ও সক্রিয়তা লাভ করেছিলেন এই কলকাতা বাসকালেই। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেলের ছাত্র থাকাকালেই। ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আবাস হয়ে ওঠে এই বেকার হোস্টেল। ১৯৪২ থেকে '৪৭ ও মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর পদচারণা ছিল এই হোস্টেলে। কমবেশি পাঁচ বছর বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। 'বেকার' শব্দটি শুনে কারও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়– এটি বোধহয় কর্মহীনদের হোস্টেল; বস্তুত তা নয়। জনৈক ইংরেজ (BAKER)-র নামে এর নামকরণ।

তিনি কলকাতার পাট চুকিয়ে ঢাকা এসেছিলেন দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্যমতে, '৪৭-র সেপ্টেম্বরে। ঢাকায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। তবে তিনি তার রাজনীতি এবং মূল রাজনীতির সবক ও দীক্ষা লাভ করেছিলেন কলকাতাতে, ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেলের ছাত্র হিসেবে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান দুটিকে ঘিরে বঙ্গবন্ধুর রয়েছে বহু স্মৃতি। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য–

'এই সময় ইসলামিয়া কলেজে আমি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি। অফিসিয়াল ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাদের পরাজিত করলাম। ইসলামিয়া কলেজই ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পরের বছরও ১৯৪৩ সালে ইলেকশনে আনোয়ার সাহেবের অফিসিয়াল ছাত্রলীগ পরাজিত হল। তারপর আর তিন বৎসর কেউই আমার মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইলেকশন করে নাই। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হত। আমি ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতাম তারাই নমিনেশন দাখিল করত, আর কেউ করত না। কারণ জানত, আমার মতের বিরুদ্ধে কারও জিতবার সম্ভাবনা ছিল না'[১১] কলেজের পাশাপাশি বেকার হোস্টেলে তার অবস্থানকালীন স্মৃতিচারণে বলেছেন:

'ছাত্রদের আপদে-বিপদে আমি তাদের পাশে দাঁড়াতাম। কোন ছাত্রের কি অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পায়না, কার ফ্রি সিট দরকার, আমাকে বললেই প্রিন্সিপাল ড. জুবেরী সাহেবের কাছে হাজির হতাম। আমি অন্যায় আবদার করতাম না। তাই শিক্ষকরা আমার কথা শুনতেন। ছাত্ররাও আমাকে ভালবাসত। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান সাহেব জানতেন, আমার অনেক অতিথি আসত। বিভিন্ন জেলার ছাত্রনেতারা আসলে কোথায় রাখব, একজন না একজন ছাত্র আমার সিটে থাকতই। কারণ সিট না পাওয়া পর্যন্ত আমার রুমই তাদের জন্য ফ্রি রুম'[১২]

১৯৪৩ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। এই সময় বঙ্গবন্ধুকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য করা হয়। আবুল হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সম্পাদক হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মনোনীত হয়ে। এর পূর্বে সোহরাওয়ার্দী সাহেবই মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

মুসলিম লীগ তখনো জমিদার-জোতদার, খান বাহাদুর ও নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুসহ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের প্রতিষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন।১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় খাজা নাজিমুদ্দীন হন প্রধানমন্ত্রী, আর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। তখন লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়। খাবার নাই, কাপড় নাই– এক অসহনীয় অবস্থা। সেসময়ে কলকাতার স্মৃতিচারণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন:

'দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ১০ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকের মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। আমরা কয়েকজন ছাত্র শহীদ সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, 'কিছুতেই জনসাধারণকে বাঁচাতে পারবেন না, মিছিমিছি বদনাম নেবেন'। তিনি বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না; কিছু লোক তো বাঁচাতে চেষ্টা করব।'

'তিনি রাতারাতি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুললেন। 'কন্ট্রোল' দোকান খোলার বন্দোবস্ত করলেন। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লিতে যেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন। চাল, আটা ও গম বজরায় করে আনাতে শুরু করলেন। ইংরেজের কথা হল, বাংলার মানুষ যদি মরে তো মরুক, যুদ্ধের সাহায্য আগে। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রথম স্থান পাবে। ট্রেনে অস্ত্র যাবে, তারপর যদি জায়গা থাকে তবে রিলিফের খাবার যাবে। যুদ্ধ করে ইংরেজ আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে?'[১৩]

কলকাতার স্মৃতিচারণে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজিরবিহীন ভালবাসার উল্লেখ করেছেন। মাঝে মাঝে যে মতবিরোধ হতো না তা নয় কিন্তু তার স্নেহ ছিল পিতার মতো। বঙ্গবন্ধু তার স্নেহ-আদর-ভালবাসা কোনোদিন ভুলতে পারেননি।

একবার আনোয়ার সাহেবকে একটা পদ-দেয়া নিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ত কথোপকথনের জের ধরে বঙ্গবন্ধু বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যান কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাকে হুদা সাহেবকে দিয়ে ধরিয়ে এনে একান্তে নিজের ঘরে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন:

'তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই একথা বলি নাই, তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলে তোমাকেই বলেছি।' আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি যে সত্যিই আমাকে ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত। যখনই তাঁর কথা এই কারাগারে বসে ভাবি, সেকথা আজও মনে পড়ে। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরেও একটুও এদিক ওদিক হয় নাই। সেইদিন থেকে আমার জীবনে প্রত্যেকটা দিনই তাঁর স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘদিন আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেউ-ই ছিনিয়ে নিতে পারে নাই এবং তাঁর স্নেহ থেকে কেউ-ই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে নাই'[১৪]

তিনি তার স্মৃতিচারণে কলকাতার এমএলএ বা জনগণের প্রতিনিধিদের লোভ এবং মানবিক অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন স্পষ্ট কথায়। সুবিধা বুঝে তাদের দলত্যাগ করা, প্রকাশ্যে ঘুষের টাকা গ্রহণ ও অমানবিকতার চিত্র প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন:

'এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল না যে, এমএলরা এইভাবে টাকা নিতে পারে। এরাই দেশের ও জনগণের প্রতিনিধি ! আমার মনে আছে , আমাদের উপর ভার পড়ল কয়েকজন এমএলএকে পাহারা দেবার, যাতে তারা দলত্যাগ করে অন্য দলে না যেতে পারে। আমি তাদের নাম বলতে চাই না, কারণ অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। একজন এমএলএকে মুসলিম লীগ অফিসে আটকানো হল। তিনি বারবার চেষ্টা করেন বাইরে যেতে, কিন্তু আমাদের জন্য পারছেন না। কিছু সময় পরে বললেন, 'আমাকে বাইরে যেতে দিন কোনো ভয় নাই। বিরোধীদল টাকা দিতেছে, যদি কিছু টাকা নিয়ে আসতে পারি আপনাদের ক্ষতি কি? ভোট আমি মুসলিম লীগের পক্ষেই দিব'। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। বৃদ্ধ লোক, সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া কিছু জানেন, কেমন করে এই কথা বলতে পারলেন আমাদের কাছে? টাকা নেবেন একদল থেকে অন্য দলের সভ্য হয়ে, আবার টাকা এনে ভোটও দেবেন না। কতটা অধঃপতন হতে পারে আমাদের সমাজের! এই ভদ্রলোককে একবার রাস্তা থেকে আমাদের ধরে আনতে হয়েছিল। শুধু সুযোগ খুঁজছিলেন কেমন করে অন্য দলের কাছে যাবেন'[১৫] আরেকজন এমএলএ'র বর্ণনা আরো হৃদয়বিদারক। যার মনুষ্যত্বহীনতায় বঙ্গবন্ধু অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন আর খ্যাপেও গিয়েছিলেন, তার বর্ণনায় লিখেছেন:

'এ সময় ফজলুর রহমান সাহেব আমাকে ডাকলেন, তিনি চিফ হুইপ ছিলেন। আমাকে বললেন, 'আপনাকে এই বারটার সময় আসাম-বেঙ্গল ট্রেনে রংপুর যেতে হবে। মুসলিম লীগের একজন এমএলএ, যিনি 'খান বাহাদুর'ও ছিলেন তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। টেলিগ্রাম করেছি, লোকও পাঠিয়েছি, তবু আসছেন না, আপনি না গেলে অন্য কেউই আনতে পারবে না। শহীদ সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন। আপনার জন্য টিকিট করা আছে'। কয়েকখানা চিঠি দিলেন। আমি বেকার হোস্টেলে এসে একটা হাত ব্যাগে কয়েকটা কাপড় নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে আসলাম। খাওয়ার সময় পেলাম না। যুদ্ধের সময় কোথাও খাবার পাওয়াও কষ্টকর। ট্রেনে চেপে বসলাম। তখন ট্রেনের কোনো সময়ও ঠিক ছিল না, মিলিটারিদের ইচ্ছামত চলত। রাত আটটায় রংপুর পৌঁছাব এটা ছিল ঠিক সময়; কিন্তু পৌঁছালাম রাত একটায়। পথে কিছু খেতেও পারি নাই, ভীষণ ভিড়। এর পূর্বে রংপুরে আমি কোনোদিন যাই নাই। শুনলাম স্টেশন থেকে শহর তিন মাইল দূরে। অনেক কষ্ট করে একটা রিকশা জোগাড় করা গেল। রিকশাওয়ালা খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ি চিনে, আমাকে ঠিকই পৌঁছে দিল। আমি অনেক ডাকাডাকি করে তাঁকে তুললাম, চিঠি দিলাম। তিনি আমাকে

জানেন। বললেন, 'আগামীকাল আমি যাব। আজ ভোর পাঁচটায় যে ট্রেন আছে সে ট্রেনে যেতে পারব না'। আমি বললাম, 'তাহলে আপনি চিঠি দিয়ে দেন, আমি ভোর পাঁচটার ট্রেনেই ফিরে যেতে চাই'। তিনি বললেন, 'সেই ভাল হয়'। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না কিছু খাব কি না, পথে খেয়েছি কি না। বললেন, 'এখন তো রাত তিনটা বাজে, বিছানার কি দরকার হবে?' বললাম, 'দরকার নাই, যে সময়টা আছে বসেই কাটিয়ে দিব। ঘুমালে আর উঠতে পারব না খুবই ক্লান্ত'। একদিকে পেট টনটন করছে, অন্যদিকে অচেনা রংপুরের মশা। গতরাতে বেকার হোস্টেলে ভাত খেয়েছি। বললাম, এক গ্লাস পানি পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। তিনি তার বাড়ির পাশেই কোথাও রিকশাওয়ালারা থাকে, তার একজনকে ডেকে বললেন, আমাকে যেন পাঁচটার ট্রেনে দিয়ে আসে। আমি চলে এলাম সকালের ট্রেনে।

কলকাতায় পৌঁছালাম আরেক সন্ধ্যায়। রাস্তায় চা-বিস্কুট কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম। রাতে আবার হোস্টেলে এসে ভাত খাই। ভীষণ কষ্ট পেয়েছি, ক্ষেপেও গিয়েছি। ফজলুর রহমান সাহেবকে বললাম, 'আর কোনোদিন এই সমস্ত লোকদের কাছে যেতে বলবেন না'[১৬]

জানা যায়, এই এমএলএ একদিন পরে এসেছিলেন । তবে পাহারার লোক রাখা সত্ত্বেও তিনি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। অথচ পূর্বে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান এসব খান সাহেব, খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীদের হাতে ছিল আর এদের সাথে ছিল জমিদার- জোতদার শ্রেণির লোকেরা। যাদের বাড়ি রাত তিনটায় পৌঁছানোর পরও অতিথিসেবা দূরে থাক, করেন না কুশল বিনিময়; শোবার বন্দোবস্ত দূরে থাক রাত জেগে থাকতে বলেন, ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধরার জন্য। শুধু তাই নয়, ভোর পাঁচটায় অতিথির সৎকার না করে ট্রেন ধরার জন্য বাসার পাশে থাকা রিকশাওয়ালাকে দিয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। এদের দ্বারা জনগণের, দেশের কোনোদিন মঙ্গল হয়নি বরং চরম ক্ষতি হয়েছে অথচ কাজ না করেও ভালো অবস্থানে থাকার ফন্দি এদের বেশ ভালো জানা ছিল। বঙ্গবন্ধুর কথায়–

'আমরা ছাত্র ছিলাম, দেশকে ভালবাসতাম, দেশের জন্য কাজ করতাম, এই সমস্ত নীচতা এই প্রথম দেখলাম, পরে যদিও অনেক দেখেছি; কিন্তু এই প্রথমবার। এই সমস্ত খান বাহাদুরের দ্বারা পাকিস্তান আসবে, দেশ স্বাধীন হবে, ইংরেজকে তাড়ানো যাবে, বিশ্বাস করতে যেন কষ্ট হত ! মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান পূর্বে ছিল খান সাহেব, খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীদের হাতে, আর এদের সাথে ছিল জমিদার-জোতদার শ্রেণির লোকেরা। এদের দ্বারা কোনোদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হত না। শহীদ সাহেব, হাসিম সাহেব যদি বাংলার যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় না করতে পারতেন এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে টেনে আনতে না পারতেন, তাহলে কোনোদিনও পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারত না। যদিও এই সমস্ত নেতাদের আমরা একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারি নাই। যার ফলে পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই এই খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীরা তৎপর হয়ে উঠে ক্ষমতা দখল করে ফেলল'[১৭]

'১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের রাজনীতিতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব, ব্রিটিশদের নানা কলাকৌশলের ফলে দেশে নানা অরাজকতা দেখা দেয়। বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। সোহরাওয়ার্দী তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা থামানোর তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ছুটে গেছেন। ...শেখ মুজিব এই দুঃসময়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পাশে থেকে তাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন'[১৮]

সেসময় শেখ মুজিব উপদ্রুত এলাকার হিন্দু-মুসলমানদের রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে চলেছেন বিভিন্ন প্রান্তে। তখন তার ছয় ভাইবোনের মধ্যে পাঁচজনই কলকাতা ও শ্রীরামপুরে ছিলেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তার ছোট ভাইকে নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন কারণ তিনি ছিলেন খুবই দুষ্টু প্রকৃতির এবং কারো কথা না-শোনার দলের–

'আমি নিজেও খুব চিন্তাযুক্ত ছিলাম। কারণ, আমরা ছয় ভাইবোনের মধ্যে পাঁচজনই তখন কলকাতা ও শ্রীরামপুরে। আমার মেজোবোনের জন্য চিন্তা নাই, কারণ সে বেনিয়া পুকুরে আছে। সেখানে এক বোন বেড়াতে এসেছে। এক বোন শ্রীরামপুরে ছিল। একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের ম্যাট্রিক পড়ে। একেবারে ছেলেমানুষ। একবার মেজোজনের বাড়ি, একবার আমার ছোট বোনের বাড়ি এবং মাঝে মাঝে আমার কাছে বেড়িয়ে বেড়ায়। কারো কথা বেশি শোনে না। খুবই দুষ্ট ছিল ছোটবেলায়। নিশ্চয়ই গড়ের মাঠে এসেছিল। আমার কাছে ফিরে আসে নাই। বেঁচে আছে কি না কে জানে! শ্রীরামপুরের অবস্থা খুবই খারাপ। যে পাড়ায় আমার বোন থাকে, সে পাড়ায় মাত্র দুইটা ফ্যামিলি মুসলমান।

কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য! মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে চিন্তা করতেও ভয় হয়! এক এক করে খবর নিতে চেষ্টা করলাম। ছোট ভগ্নিপতি হ্যারিসন রোডে টাওয়ার লজে থাকে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে যেয়ে খবর নিলাম, সে চলে গেছে কারমাইকেল হোস্টেলে। নাসের মেজোবোনের কাছেও নাই, আমার কাছেও নাই। আমার সবচেয়ে ছোট ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'নাসের ভাই ১৬ই আগস্ট আমার এখানে এসেছিল, থাকতে বললাম থাকল না, আমিও জোর করলাম না। কারণ আমার জায়গাটাও ভাল না। আমাদেরও পালাতে হবে'[১৯]

কলকাতাতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাতে, কখনো মুসলমানরা হিন্দুদের কাছে মার খেয়েছে আবার হিন্দুরাও মুসলমানদের কাছে মার খেয়েছে। আবার অনেক হিন্দু যেমন মুসলমানদের রক্ষা করেতে গিয়ে জীবন দিয়েছে, অনেক মুসলমানও হিন্দু পড়শিকে রক্ষা করতে গিয়েও জীবন দিয়েছে। তারই খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে–

'লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজে রিফিউজিদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দোতলায় মেয়েরা, আর নীচে পুরুষরা। কর্মীদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমাকেও মাঝে মাঝে থাকতে হয়। মুসলমানদের উদ্ধার করার কাজও করতে হচ্ছে । দু'এক জায়গায় উদ্ধার করতে যেয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদেরও উদ্ধার করে হিন্দু মহল্লায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে, মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন ১৬ই আগস্ট মুসলমানরা ভীষণভাবে মার খেয়েছে। পরের দুই দিন মুসলমানরা হিন্দুদের ভীষণভাবে মেরেছে। পরে হাসপাতালের হিসাবে সেটা দেখা গিয়েছে। ...নাসেরের একটা পা ছোটকালে টাইফয়েড হয়ে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়। সে পা দেখিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়ে। দিনভর এ্যাম্বুলেন্সে থাকে, সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে শ্রীরামপুর যায়। ট্রেনে তিন ঘণ্টা লাগে। কয়েকবার ট্রেনে আক্রমণ হয়েছে। কোনোমতে বেঁচে গিয়েছে। একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে যেয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়াপড়শিকে রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। মুসলমান লীগ অফিসে যেসব টেলিফোন আসত, তার মধ্যে বহু টেলিফোন হিন্দুরাই করেছে। তাদের বাড়িতে মুসলমান আশ্রয় দিয়েছে, শীঘ্রই এদের নিয়ে যেতে বলেছে, নতুবা এরাও মরবে, আশ্রিত মুসলমানরাও মরবে'[২০]

কলকাতা শহরকে ভাগ করা নিয়েও রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নানা স্মৃতি। কলকাতাকে ছাড়তে চাননি কলকাতার মুসলমানরা। শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী মোহম্মদ আলী তো ঘোষণাও করেছিলেন কলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী থাকবে। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের ছেড়ে চলে আসতেও বঙ্গবন্ধুর যেমন কষ্ট হয়েছিল তেমনি সেখানকার কর্মীদেরও হয়েছিল। বাংলাদেশের কলকাতা ভাগের সিদ্ধান্ত যে আগেই হয়ে গিয়েছিল তাও তিনি জানতেন না–

'১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হল ভারতবর্ষ ভাগ হবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভাগ করতে রাজি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবেনা। বাংলাদেশের কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলাগুলিও ভারতবর্ষে থাকবে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও মুসলিম লীগ নেতারা বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বর্ধমান ডিভিশন আমরা না-ও পেতে পারি। কলকাতা কেন পাব না? কংগ্রেস ও হিন্দু মহসভা বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে বলে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমরাও বাংলাদেশ ভাগ হতে দেবনা, এর জন্য সভা করতে শুরু করলাম। আমরা কর্মীরা কি জানতাম যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে এই ভাগের ফর্মুলা? বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা। আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্র আসামের এক জেলা– তাও যদি গণভোটে জয়লাভ করতে পারি। আর বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলি কেটে হিন্দুস্থানে দেওয়া হবে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। কলকাতার কর্মীরা ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা এসে আমাদের বলত, তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আমাদের কপালে কি হবে খোদাই জানে! সত্যই দুঃখ হতে লাগল ওদের জন্য। গোপনে গোপনে কলকাতার মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল, যা হয় হবে, কলকাতা ছাড়া হবে না। শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী মোহম্মদ আলী ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা আমাদের রাজধানী থাকবে। দিল্লি বসে অনেক পূর্বেই যে কলকাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একথা তে আমরা জানতামও না, আর বুঝতামও না'[২১]

কলকাতার স্মৃতিচারণজুড়ে বঙ্গবন্ধুর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে নানা কর্মকাণ্ড এবং কথোপকথন, ইসলামিয়া কলেজ, বেকার হোস্টেল, রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ, সহপাঠীগণ, ভাইবোন, বোনদের স্বামী, স্ত্রী রেণু– সবার প্রসঙ্গ এসেছে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে বিরূপ পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি

নিয়েছেন আবার কখনো অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। তবে এখানকার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আর তাঁর বিএ পাস করা নিয়ে রয়েছে মনে রাখার মতো স্মৃতি–

'আসানসোল ইউরোপিয়ান ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এবং নিজ হাতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম, পরবর্তী জীবনে তা আমার অনেক উপকার করেছিল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে। এই সময় মনস্থির করলাম, আমাকে বিএ পরীক্ষা দিতে হবে। ড. জুবেরী আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, 'তুমি যথেষ্ট কাজ করেছ পাকিস্তান অর্জন করার জন্য। তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। তুমি যদি ওয়াদা কর যে, এই কয়েক মাস লেখাপড়া করবা এবং কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবা এবং পাইনাল পরীক্ষার পূর্বেই এসে পরীক্ষা দিবা, তাহলে তোমাকে আমি অনুমতি দিব' ।তখন টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি ওয়াদা করলাম, প্রফেসর তাহের জামিল, প্রফেসর সাইদুর রহমান এবং প্রফেসর নাজির আহমদের সামনে। আমি অনুমতি নিয়ে আমার এক বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী– তার নাম ছিল শেখ শাহাদাত হোসেন, ১৯৪৬ সালে বিএ পাস করেছে, এখন হাওড়ার উল্টোডাঙ্গায় চাকরি করে, ওর কাছে চলে গেলাম, সমস্ত বইপত্র নিয়ে।

পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় চলে আসি। হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছি। আমার ছোট বোনের স্বামী বরিশালের এডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত তখন পার্ক সার্কাসে একটা বাসাভাড়া নিয়েছেন। আমার বোনও থাকত, তার কাছেই উঠলাম। কিছুদিন পরে রেণুও কলকাতায় এসে হাজির। রেণুর ধারণা, পরীক্ষার সময় সে আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাস করব। বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।

শেখ শাহাদাত হোসেন দুই মাসের ছুটি নিয়ে আমাকে পড়তে সাহায্য করেছিল। পরে জীবনে অনেক ক্ষতি আমার সে করেছে। এর জন্য তাকে কোনোদিন কিছু বলি নাই। ওর বাড়ি আমার বাড়ির কাছাকাছি'[২২]

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশাপাশি আর যে ক'জন রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে তাঁরা হলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব রাজনীতির মাঠে পদচারণা করেন, উক্ত চার রাজনৈতিক ব্যক্তিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো পথ তাঁর ছিলনা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, সেসময় শেখ মুজিব একজন তরুণ ছাত্রনেতা। সেসময় এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বেই তাঁকে চলতে হয়েছে'[২৩]

এই চলার পথে অনেক সময় তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। কখনও নিজের অভিমত– আবদারে, অধিকারে জোর দিয়ে, স্পষ্ট কিংবা রূঢ় ভাষায়ও ব্যক্ত হয়েছে অবস্থার প্রেক্ষাপটে। কিন্তু ভিন্ন মতের হলেও সেসময় দলমত নির্বিশেষে বড়োরা ছোটদের স্নেহ করতেন, শাসনও করতেন। বড়োদের সম্মান করা, নিজের ভুলত্রুটি অকপটে স্বীকার করে নেওয়া, ক্ষমা চাওয়া– বিষয়গুলো সবসময়েই মানবিক উদারতার পরিচায়ক। হাশিম সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুর মতদ্বৈততার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর প্রকাশ ঘটেছে সুন্দরভাবে তার স্মৃতিচারণে-

'একদিন নূরুদ্দিন, নূরুল আলম ও কাজী ইদ্রিস সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে, আমার বাসার কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?' এরা আমাকে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, হাশিম সাহেব প্রেস বিক্রি করে ফেলতে চান, আমরা চাঁদা তুলে প্রেস করেছি, মুখ দেখাব কি করে?' আমি বললাম, 'আমি কি করব?' সকলে বলল, 'তোমাকে বাধা দিতে হবে।' বললাম, 'আমি কেন বাধা দেব? আমি পাকিস্তানে চলে যাব। আর কবে দেখা হবে ঠিক নাই। আমার প্রয়োজন কি? তোমরা হাশিম সাহেবের খলিফা, আমার নাম তো পূর্বেই কাটা গেছে, আর কেন?' সকলে বলল, 'তুমি বললেই আর ভয়েতে বিক্রি করবে না।' বললাম 'ঠিক আছে আমি অনুরোধ করতে পারি।'

পরের দিন মিল্লাত প্রেসে গিয়ে হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করি। পাশের ঘরে আমার সহকর্মীরা চুপ করে বসে আছে; শুনবে আমাদের কথা। আমি শান্তভাবে তাঁকে বললাম, 'প্রেসটা নাকি বিক্রি করবেন?' বললেন, 'উপায় কি, প্রত্যেক মাসেই লোকসান যাচ্ছে, কি করি? আর চালাবে কে?' আমি বললাম,'খন্দকার নূরুল আলম তো ম্যানেজার হয়ে এতকাল চালাল। খরচ কমিয়ে ফেলল। প্রেসটা বিক্রি করে দিলে কর্মচারীদের থাকবে কি? আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। সমস্ত বাংলাদেশ থেকে চাঁদা তুলেছি, লোকে আমাদের গালি দিবে।' হাশিম সাহেব হঠাৎ রাগ করে ফেললেন এবং বললেন, 'আমাকে বেচতেই হবে, কারণ দেনা শোধ করবে কে?' আমি বললাম, 'কয়েকমাস পূর্বে যে প্রেসটা বিক্রি হল তাতে দেনা শোধ হয় নাই?' তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, আমারও রাগ হল। উঠে আসার সময় বলে এলাম, 'প্রেস বিক্রি করতে গেলে আমি বাধা দেব, দেখি কে আসে এই মিল্লাত প্রেসে?' হাশিম সাহেব খুব দুঃখ পেলেন আমার কথায়। পরের দিন ঐ সমস্ত বন্ধুরা আমার কাছে এসে বলল, 'হাশিম সাহেব খানা খান না। শুধু বলেন, 'মুজিব আমাকে অপমান করল!' তুই আবার দেখা কর, আর বলে দে, যা ভাল বোঝেন করেন।' আমি বললাম, 'তোমরা খেলা পেয়েছ!'

আমি শহীদ সাহেবের কাছে এখন রোজই যাই। তাঁর সাথে মাঝে মাঝে সভাসমিতিতে যাই– যেখানে সাম্প্রদায়িক সৎভাব সৃষ্টির জন্য সভা হয়। শহীদ সাহেবকে বললাম, সকল ইতিহাস। তিনি আমার উপর রাগ করলেন, কেন আমি খারাপ ব্যবহার করলাম হাশিম সাহেবের সাথে! কত বড় উদার ছিলেন শহীদ সাহেব। আমি হাশিম সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, 'আপনি মনে কিছু করবেন না আমার এভাবে কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমার কিছুই বলার নাই।' হাশিম সাহেব হিন্দুস্থানে থাকবেন, আমি চলে আসব পাকিস্তানে। আমার বাড়িও পাকিস্তানে। আমি যাওয়াতে তিনি খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ভিন্ন মত হতে পারি; কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছি, সেটা তো ভোলা কষ্টকর। আমার যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি , তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষেরই হয়েই থাকে। আমার নিজেরও একটা দোষ ছিল, আমি হঠাৎ রাগ করে ফেলতাম। তবে রাগ আমার বেশি সময় থাকত না'[২৪]

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, সত্যই ভদ্রলোক জাদু জানতেন। মুহূর্তেই আবহাওয়া পরিবর্তন করে দিতে পারতেন মহাত্মাজী–

'সেদিন রবিবার ছিল। আমি সকালবেলা শহীদ সাহেবের বাসায় যাই। তিনি আমাকে বললেন, 'চল ব্যারাকপুর যাই। সেখানে খুব গোলমাল হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীও যাবেন'। আমি বললাম, 'যাব স্যার'। তাঁর গাড়িতে উঠলাম, নারকেলডাঙ্গা এলাম। সেখান থেকে মহাত্মাজী, মনু গান্ধী, আভা গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারি এবং কিছু কংগ্রেস নেতাও সাথে চললেন। ব্যারাকপুরের দিকে রওয়ানা করলাম। হাজার হাজার লোক রাস্তার দু'পাশে ভিড় করেছে, তাদের শুধু এক কথা, 'বাপুজী কি জয়'। ব্যারাকপুরে পৌঁছে দেখি এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। মহাত্মাজী রবিবার কারও সাথে কথা বলেন না, বক্তৃতা তো করবেনই না। মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী 'আলহামদু' সূরা ও 'কুলহু' সূরা পড়লেন। তারপরে রামবন্দনা গান গাইলেন। মহাত্মাজী লিখে দিলেন, তার বক্তৃতা সেক্রেটারি পড়ে শোনালেন। সত্যই ভদ্রলোক জাদু জানতেন। লোকে চিৎকার করে উঠল, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। সমস্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে'[২৫]

শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপরই শুরু হয় ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন । শেখ মুজিব ছিলেন সেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার-সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত বাংলাদেশকে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো সাহায্য করে। বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা অর্জনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফায়সালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। ... ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

১৯৭২, ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের বিশেষ বিমানে লন্ডন থেকে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জি। শশাঙ্ক ব্যানার্জির অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণে সে ঐতিহাসিক ১৩ ঘণ্টার যাত্রার সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

'পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে এলেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে তাঁকে দিল্লি হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে সহযাত্রী হই আমি। ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, ভোর ছয়টা। লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছালেন বঙ্গবন্ধু। তাঁকে স্বাগত জানালেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিভাগের কর্মকর্তা ইয়ান সাদারল্যান্ড ও লন্ডনে

নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার আপা বি পন্থ। আমাকে দেখে আবেগাপ্লুত শেখ মুজিব বলেন, 'ব্যানার্জি, এখানেও আছেন!' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে শেখ মুজিবের বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিলেন ইয়ান। আর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দেন আপা বি পন্থ। ৩০ মিনিট ধরে চলে ইন্দিরা-মুজিব টেলিফোন আলাপচারিতা।

ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দিরা গান্ধী আবার বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে যাত্রাপথে সহযাত্রী হলেন শশাঙ্ক ব্যানার্জি। সঙ্গে ছিলেন সেসময়ের ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ভেদ মারওয়া। আরো ছিলেন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন ও তাঁর স্ত্রী হামিদা হোসেন।

বিমানে তাঁরা পাশাপাশি আসনে বসলেন। সামনের টেবিলে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সুগন্ধীময় এরিনমোর তামাক, আর সেই বিখ্যাত পাইপ। উৎফুল্ল মুজিবের তখন দেশে ফেরার তর সইছে না। আপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ'। তিনি ধন্যবাদ জানালেন দীর্ঘদিন তাঁকে সহযোগিতার জন্য। বললেন, 'ব্যানার্জি এবার একটি সহযোগিতা চাই'। শশাঙ্ক বললেন, 'আয়ত্তের মধ্যে হলে অবশ্যই চেষ্টা করব'। ধীরলয়ে মুজিব বললেন, 'দিল্লিতে ইন্দিরার সঙ্গে বৈঠকের আগেই তাঁর কাছে একটি খবর পৌঁছানো দরকার। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় মিত্রবাহিনী সদস্যদের ৩১মার্চ ১৯৭২ সালের মধ্যে ভারতে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে'। তিনি বললেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে কথা হয়েছে। ভারতীয় মিত্রবাহিনী চলে গেলে বাংলাদেশ ব্রিটিশ

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শশাঙ্ক ব্যানার্জি

সরকারের স্বীকৃতি পেতে আর কোনো বাধা থাকবে না। ... বঙ্গবন্ধু জানালা দিয়ে শ্বেতশুভ্র সাদা মেঘের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। তাঁর চোখ ভরে উঠেছে জলে। তিনি বললেন, 'ব্যানার্জি আপনিও ধরুন। রিহার্সেল দিয়ে নিই'। আমরা দু'জনে মিলে গানটা গাইলাম। বঙ্গবন্ধু চোখের পানি লুকানোর চেষ্টা করে বললেন, 'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরও কঠোর সংগ্রাম অপেক্ষা করে আছে। বুকে শুধু একটাই বল, আমার দেশের আপামর মানুষ'। শশাঙ্ককে অবাক করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ গানটি হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। কেমন হবে বলেন তো?' শশাঙ্ক জবাব দিলেন, 'ইতিহাসে তাহলে প্রথমবারের মতো দুটি দেশের জাতীয় সংগীতের লেখক হবেন একই ব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

বিমানের যাত্রাপথে বঙ্গবন্ধুকে কলকাতা হয়ে দেশে ফেরার অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বার্তা এল। কলকাতাবাসী বঙ্গবন্ধুকে দেখতে চায়। তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরতি বার্তায় জানালেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতাবাসীর সহযোগিতা তাঁকে কৃতজ্ঞ করেছে। কিন্তু দিল্লি হয়ে ঢাকা ফিরতে তাঁর তর সইছে না। তবে শিগগিরই তিনি কলকাতা আসবেন। বার্তা পাঠিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'পথ তো মনে হয় ফুরাতে চাইছে না। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আকাশ, মানুষ, প্রকৃতি আমাকে ডাকছে। এ যে কী অনুভূতি, আমি বোঝাতে পারব না!' শশাঙ্ক ব্যানার্জি বললেন, 'দিল্লি অবতরণের তখন আর সময় বেশি বাকি নেই। পাইলট আমাদের দুটি ছবি তুলে দিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে তোলা সেই ঐতিহাসিক ছবিটি এখনো খুব যত্ন করে তুলে রেখেছি।'

দিল্লিতে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার সরণ সিংহসহ আরো অনেকে।রাষ্ট্রপতি ভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্য কলকাতা থেকে আনা গুড়ের সন্দেশ, সমুচা, শিঙ্গাড়া আর দার্জিলিং চা তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল। মুজিব-ইন্দিরা বৈঠকে তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে কথা হয়'[২৬]

স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আকাশ, মানুষ, প্রকৃতি দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে বঙ্গবন্ধুকে কলকাতায় সশরীরে আনা যায়নি সত্য কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্য কলকাতা থেকে আনা গুড়ের সন্দেশ, সমুচা, শিঙ্গাড়া আর দার্জিলিং চা পরিবেশিত হয়েছিল– যা তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল। এরপর তিনি '৭২, ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কলকাতা সফরে যান। বঙ্গবন্ধুর কলকাতা সফরের কথা জানা যায় তোফায়েল আহমেদের স্মৃতিচারণে–

'স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে '৭২-র ফেব্রুয়ারি কলকাতা সফরের কথা। বিমানবন্দরে যখন অবতরণ করলেন, সে কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা দুর্গাপ্রসাদ ধর, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে নেয়া যায়নি। কারণ তাঁকে একনজর দেখার জন্য রাজপথে লাখ লাখ মানুষ। হেলিকপ্টারে করে রাজভবনে নেয়া হয়েছিল। বিকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ২০ লক্ষাধিক লোকের মহাসমাবেশে বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আপনারা আমার মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। আপনাদের কাছে আমি ঋণী; কিন্তু আমার তো দেবার কিছু নাই। আমি তো রিক্ত, নিঃস্ব!' কবির ভাষায় হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করলেন, 'রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালবাসা দিয়ে গেলাম তাই'। তারপরে রাজভবনে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছিলেন, 'আমি ভারতের কাছে ঋণী। মুক্তিযুদ্ধে আমাকে অর্থ, অস্ত্র, আশ্রয়সহ সার্বিক সাহায্য দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার কাছে আমি ঋণী। আমি আপনাকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাই। আপনি যাবেন বাংলাদেশে ১৭ই মার্চ,– যেদিন আমার জন্মদিন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি চাই, আপনি বাংলাদেশে যাওয়ার আগে আপনার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়ে আসবেন'। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৭ই মার্চ বাংলাদেশে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে বক্তৃতা করেছেন। তার আগেই ১২ মার্চ বিদায়ী কুচকাওয়াজের মধ্যদিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতে ফিরে গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৫-'৪৬ শিক্ষাবর্ষে কলকাতার তৎকালীন ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ)-র ছাত্র ছিলেন। তিনি তখন থাকতেন বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে। সেই কক্ষটি এখন 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ'। কলকাতার তালতলায় এই হোস্টেলটির অবস্থান। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বাড়িটির তৃতীয়তলায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত কক্ষটি। তৃতীয়তলায় উঠলেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কারাজীবনের কথা পাথরে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে সাদা মার্বেল ফলকে।

'১৯৯৮ সালে ২৪ নম্বর কক্ষটিকে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে সংরক্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কক্ষটির সঙ্গে ২৩ নম্বর কক্ষটিও জুড়ে দেওয়া হয়। ২৩ নম্বর কক্ষে বঙ্গবন্ধু পড়াশোনা করতেন আর ২৪ নম্বর কক্ষে ঘুমাতেন। '৯৮ সালের ৩১ জুলাই স্মৃতিকক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে ছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত তৎকালীন বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার শেখ আহমেদ জালাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্য সাধন চক্রবর্তী, আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ ড. সত্যব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

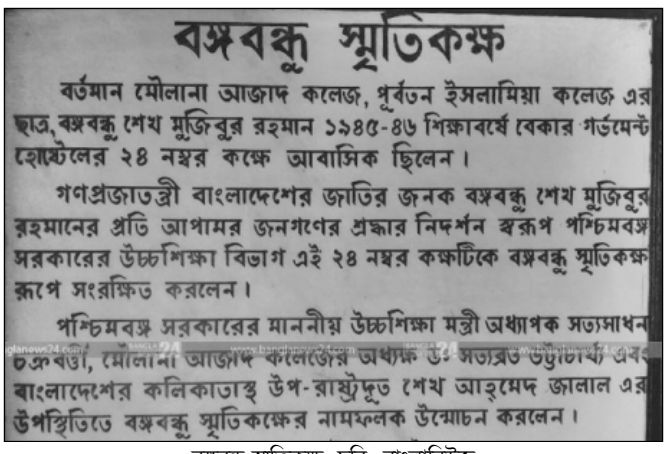

বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ

বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ, পূর্বতন ইসলামিয়া কলেজ এর ছাত্র,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে বেকার গর্ভমেন্ট হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে আবাসিক ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আপামর জনগণের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ এই ২৪ নম্বর কক্ষটিকে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ রূপে সংরক্ষিত করলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ ড. সত্যব্রত ভট্টাচার্য এবং বাংলাদেশের কলিকাতাস্থ উপ-রাষ্ট্রদূত শেখ আহমেদ জালাল এর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষের নামফলক উন্মোচন করলেন।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ, ছবি- বাংলানিউজ

২৪ নম্বর কক্ষে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর পড়ার টেবিল-চেয়ার, কাঠের আলমারি ও খাট। টেবিলের ওপরে বঙ্গবন্ধুর একটি চিত্র। রয়েছে মুজিব কোট পরিহিত মার্বেল

পাথরে তৈরি বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যও। এখানে প্রতি বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

পাশের ২৩ নম্বর কক্ষটি সাজানো হয়েছে ভিন্নভাবে। সেখানে আছে কাঠের ফ্রেমে বঙ্গবন্ধুর একটি আলোকচিত্র এবং বেশকিছু বই। বইগুলোর বেশির ভাগই বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা। প্রতিদিনই বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত কক্ষটি পরিদর্শনে'[২৮]

ভারতীয় 'আরম্ভ' পত্রিকার এক সাংবাদিক হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা করেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণে। তিনি লিখেছেন ৭৬ বছর পর ফিরে এসেছেন বঙ্গবন্ধু তার নিজ কলেজ–'কলকাতার সেন্ট্রাল ইসলামিয়া কলেজে'।

তিনি অনুভব করছেন, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনে আলোড়িত হয়েছে তাঁর শিক্ষাঙ্গন, উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে নবপ্রজন্মের পড়ুয়ারা, শিক্ষক আর বিদগ্ধজনরা। তিনি তার বাক-বুননে বর্ণনাও করেছেন অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে। তাঁর যুক্তিতেও রয়েছে যৌক্তিকতা। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন:

ঐতিহাসিক বেকার হোস্টেল, ছবি- বাংলানিউজ

'২৫ নভেম্বরের দুপুর। শীতের মৃদু কম্পন, মনোহর গুঞ্জন আর এক ধরনের বিস্ময়কে স্পর্শ করে মধ্য কলকাতার মৌলানা আজাদ মহাবিদ্যালয়ে (পূর্বতন সেন্ট্রাল ইসলামিয়া কলেজ) ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাস নির্মাতা প্রাক্তনীয় সগৌরব প্রত্যাবর্তনে আলোড়িত শিক্ষাঙ্গন, উৎসবমুখর হয়ে উঠল নবপ্রজন্মের পড়ুয়ারা; শিক্ষক আর বিদগ্ধজনকে অহরহ স্পর্শ করছে স্মৃতি; ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত দরাজ কণ্ঠের ঘোষণা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ওই ঐতিহাসিক সমাবেশ, জনস্রোতের সামনে দুঃসাহসী, সংশয়হীন বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি সবাই দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করছে তাঁর তেজ, তাঁর অঙ্গীকার, তাঁর বৈষম্যবিরোধী মুষ্টি। নিজের কলেজে তাঁর বজ্রকণ্ঠের উচ্চারণ আর অশরীরী উপস্থিতিতে স্মৃতি উদযাপনে মেতে উঠলাম আমরা।

এই মুক্তির স্বপ্ন কি অনাকাঙ্ক্ষিত? বিশ্বের গরিষ্ঠসংখ্যক সব দেশের সব মানুষের কাছে? যদি উত্তরটি হয় ইতিবাচক তাহলে এখানেই বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর কালোত্তীর্ণ। কারণ যে কোনো বিনাশ, যে কোনো ধস, যে কোনো উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর একাত্তরের ৭ই মার্চের নিনাদিত ঘোষণা চির প্রাসঙ্গিক। বিলম্বিত হলেও রেসকোর্সের মহাসমাবেশে প্রদত্ত তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যে দলিলের স্বীকৃতি দিয়ে (৩০ অক্টোবর ২০১৭) ইউনেস্কো বুঝিয়ে দিল, শেখ মুজিব কেবল বাংলাদেশের নন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও নন, গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী শক্তির আরেক মহান পরাজয়হীন

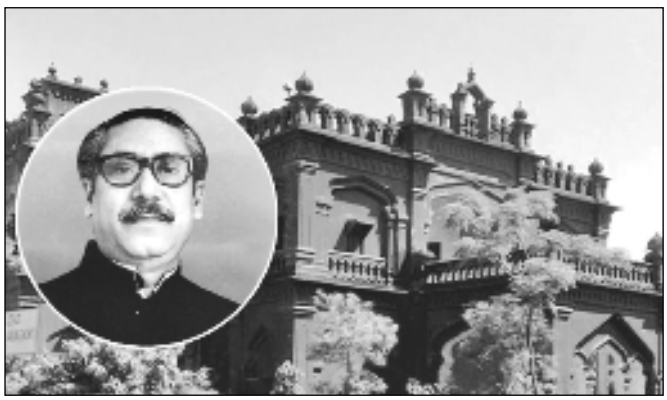

চিত্র: ইসলামিয়া কলেজ

মশাল। এ কারণেই কলকাতার উপ-দূতাবাসের উদ্যোগে নিজের কলেজে ৭৬ বছর পর বঙ্গবন্ধুর অশরীরী আর সকণ্ঠ প্রত্যাবর্তনে আমরা আলোড়িত। তাঁর ওই চিরস্মরণীয় উচ্চারণ, দুঃসাহসী ঘোষণা যে কোনো উৎপীড়িত, অবরুদ্ধ এবং দিশাহীন জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেবে– সদার্থে উচ্চারিত শব্দ মানুষের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করে সংযোজিত করতে থাকে ত্রিকালকে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মানব প্রকৃতি আর সমাজের গাঢ় সম্পর্কের রক্ষকে পরিণত হয়ে মানবিক মহিমাকে উঁচিয়ে ধরে আলোকিত-বিকশিত করে সত্তার গভীরকে। আরেকটি কথা বলা জরুরি, বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম একজন বাঙালি জননেতার কণ্ঠস্বরকে বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো জানাতে চাইল– দীর্ঘায়ু বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠছে। তাঁর মৃত্যুহীন ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। চষে বেড়াচ্ছে দুনিয়া। এটাও বাংলাদেশ আর বাঙালির আরেক সাফল্য। আমরা গর্বিত'[২৯]

উপরের লেখনীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর 'কলকাতা স্মৃতি' শুধু কলকাতাতেই আবদ্ধ থাকেনি। তাঁর 'কলকাতা স্মৃতি' কালকে অতিক্রম করেছে এবং সে স্মৃতি কালোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯।
২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৯।
৩. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.১০।
৪. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.১১।
৫. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৪।
৬. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৫।
৭. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৬।
৮. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৮।
৯. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৮-৯।
১০. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৭।
১১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৬-১৭।
১২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৩৭।
১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ১৭-১৮।
১৪. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৯।
১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৩-৩৪।
১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৪-৩৫।
১৯. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬৫-৬৬।
২০. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬৬-৬৭।
২১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৩।
২২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৭১-৭২।
২৩. প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, সোহরাওয়ার্দী-মুজিব সম্পর্ক কতিপয় খণ্ডচিত্র (১৯৩৮-'৪৯) 'নিরীক্ষা' জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ২১।
২৪. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৯-৮০।
২৭. তোফায়েল আহমেদ, বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে কিছু স্মৃতি, দৈনিক যুগান্তর, ১৭ মার্চ ২০১৮।
২৮. ভাস্কর সরদার– সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট, ইতিহাসের পাতায় বেকার হোস্টেল, বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর. কম/ আপডেট: ২০১৭, ১৭ মার্চ।
২৯. (লেখক, ভারতীয় সাংবাদিক, 'আরম্ভ' পত্রিকা, কলকাতা নিজের কলেজে বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন, আরশিনগর, বাহারউদ্দিন, ৬ ডিসেম্বর ২০১৭)।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

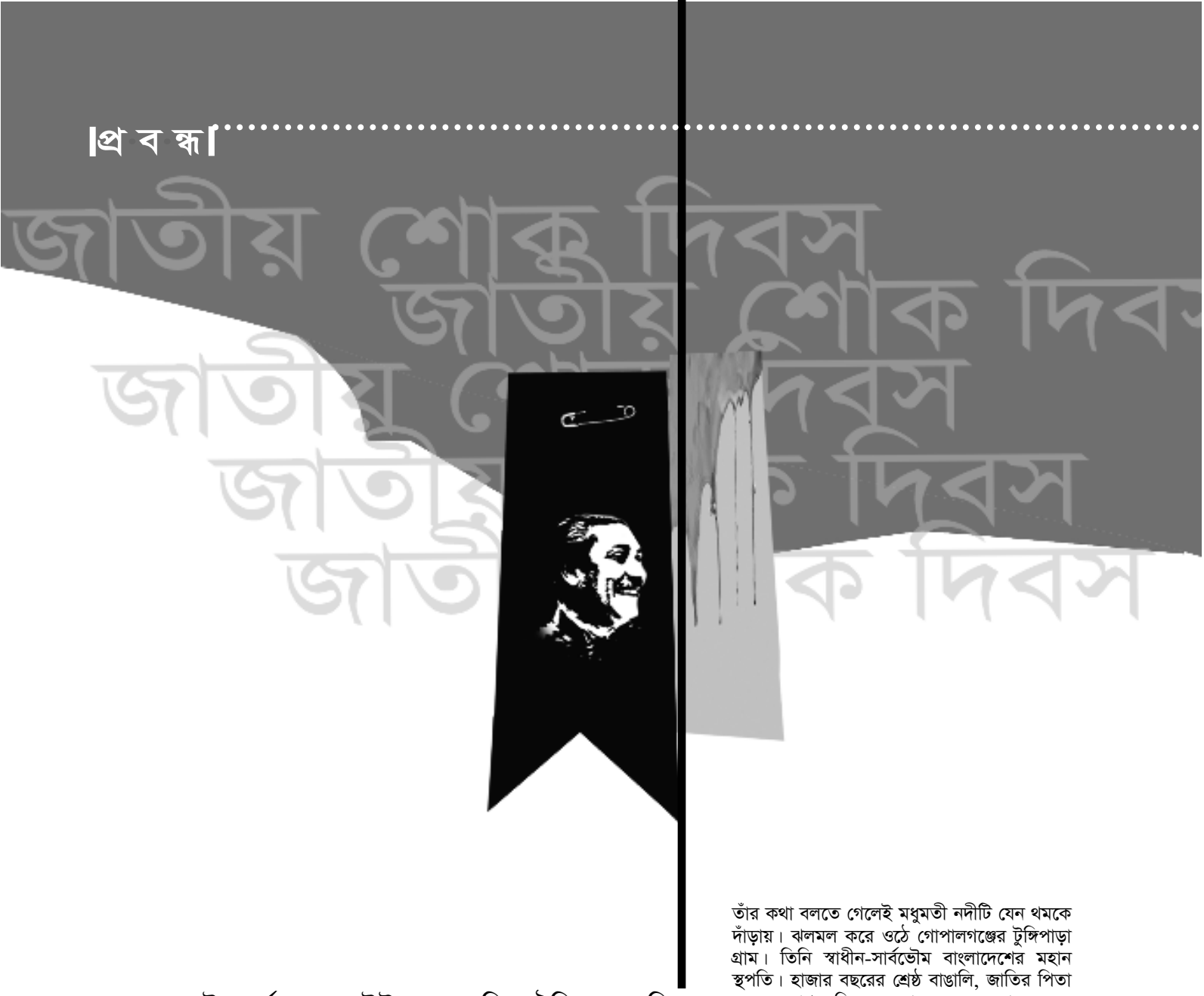

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

শ্যামল দত্ত

তাঁর কথা বলতে গেলেই মধুমতী নদীটি যেন থমকে দাঁড়ায়। ঝলমল করে ওঠে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬-র ৬ দফা, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইংরেজ শাসনের পর বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে সোচ্চার তাঁর বজ্রকণ্ঠ।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জাতীয় পরিষদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়ে জয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক এই বিজয়কে মেনে নিতে পারে না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ১ মার্চ সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে দেন। স্বৈরশাসকের এই হঠকারিতার জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। আন্দোলনের চূড়ান্ত এক পর্যায় ৭ই মার্চ, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। এই ভাষণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে নেতা-কর্মীদের প্রায় সারাদিন বৈঠক চলে। বৈঠকে ভাষণের একটি খসড়াও তৈরি করা হয়। বিদগ্ধ রাজনৈতিক নেতারা সেদিন তাঁকে অনেক পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘর থেকে বের হবার আগে সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা স্বামীকে বলেছিলেন, কারও শেখানো কথা বলার দরকার নেই। তোমার মন থেকে যে কথা আসে, তাই বলবে। বঙ্গবন্ধু স্ত্রীর এই কথাটি রেখেছিলেন।

রেসকোর্স ময়দানে দিনভর অপেক্ষমান অসংখ্য জনতার সামনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছিল একান্তই তাঁর মনের কথা। বঙ্গবন্ধু সেদিন হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা। নিজেকে তিনি তাঁর সামনে অপেক্ষমান জনতারই একজন ভেবেছিলেন। আর তাই ভাষণে নিজের ঘরোয়া ভাষায় তিনি জনসাধারণের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। এই ভাষণের কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কখনও গভীর আবেগ আবার কখনও তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হলে তার পরিণতির কথাও উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। শুরুতেই শ্রোতা-দর্শকের সামনে নিজেকে তাদেরই একজন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন: 'ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'। এরপর তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বঞ্চিত বাঙালির করুণ ইতিহাসের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কীভাবে বিজয়ী বাঙালিকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে, সেই প্রেক্ষাপটও উঠে আসে ভাষণে। আর সেই মুহূর্তেই তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বরে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে'।

কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য সব কিছু বন্ধ করে দেওয়ার পর সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য ... রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে।... ২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন'। এ ধরনের অসহযোগের ফলে শাসকগোষ্ঠী যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার জন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে তারও স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল তাঁর ভাষণে। বলেছেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'। স্বৈরশাসক বাঙালির ওপর নিপীড়ন চালাতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে তিনি সেনানিবাসে থাকা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না'।

গৃহযুদ্ধের এই চরম পরিস্থিতিতে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে, সেই আশঙ্কাও ছিল তাঁর। সেজন্য প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন, 'মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়'। আরও বলেছেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, আরও রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্'। ঠিক এর পরই তিনি ঘোষণা করেছেন এই ভাষণের মর্মবাণী, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

সম্পূর্ণ অলিখিত একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে গোটা জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করা ছিল এই ভাষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। বোধহয় এই কারণেই বিশ্বের বরেণ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও তিনি অনন্য, অসাধারণ। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণও বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ব শোষক আর শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, আমি শোষিতের পক্ষে'। তাঁর কথার সুরে সুর মিলিয়ে কিউবার প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, 'শোষিতের বাঁচার সংগ্রামে আমিও মুজিবের সাথী'। তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়'।

বিশ্বমানবতা ও শান্তির পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছেন সবসময়। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো তাঁকে শান্তি, ঐক্য ও প্রগতির মহানায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭২-এর ১৭ মার্চ, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় এক জনসভায় বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু। জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কেননা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তিনিই প্রথম বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলাভাষার মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। আর সেজন্য ১৯৭৩ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র তাঁকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করে বলেন, শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধু।

যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, ভারতের জাতিরজনক মহাত্মা গান্ধী, শ্রীলংকার স্বাধীনতার মূলনায়ক বন্দরনায়েকে, কিউবা বিপ্লবের রূপকার চে গুয়েভারা, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মুক্তির প্রতীক মার্টিন লুথার কিংসহ বিশ্ববরেণ্য অনেক নেতাকে আততায়ীর হাতে অথবা নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। ঠিক সেভাবেই প্রাণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে তাঁর এই মৃত্যুর ঘটনা আরও নির্মম। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার রূপকার ও জাতিরজনক আহমেদ সুকর্ণ জীবনের অন্তিমকাল নির্জন কারাগারে অতিবাহিত করেছেন। অথচ স্বাধীনতার এই মহানায়কেরা প্রত্যেকেই নিজের দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গ করেছেন।

১৭৭৫ সালের ২৩ মার্চ, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে পেট্রিক হেনরি ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয় দাও মৃত্যু। ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রে পেনসেলভেনিয়ার গেটিসবার্গে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর আব্রাহাম লিংকন শুনিয়েছিলেন গণতন্ত্রের মূল কথা: জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। ১৯৪০ সালের ১৩ মে, যুক্তরাজ্যের উইনস্টন চার্চিল দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমার। আছে শুধু রক্ত, কষ্ট, অশ্রু আর ঘাম। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট, ভারতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জাতিকে স্বাধীনতার জন্য অহিংস আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন চরম হুঁশিয়ারি, ভারত ছাড়ো। ১৯৫৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান করে বলেছেন, স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই। ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট, বর্ণবাদের বিষবাষ্পে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্রেও কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, আমি স্বপ্ন দেখি একদিন জাতি জেগে উঠবে, কারণ জন্মসূত্রে সবাই সমান।

বিশ্বনেতৃবৃন্দের এ সব ঐতিহাসিক ভাষণের পাশাপাশি ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষণটি এতোদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এখন বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই ভাষণ। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে সম্প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কর্মসূচির আওতায় এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউনেস্কো ১৯৯২ সালে এই কর্মসূচি চালু করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দালিলিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের তাগিদে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড বিশ্বের সেরা বক্তৃতাগুলোর একটি সংকলন গ্রন্থ বের করেনঃ 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেসঃ দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার হিস্ট্রি'। এই গ্রন্থেও স্থান পায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ফিল্ম ডিভিশন ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণটি ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মে চিত্রায়ন করেছিল। পরে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফিল্ম ডিভিশনের বাঙালি কর্মীরা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন জাতির ঐতিহাসিক প্রামাণ্যদলিল। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। এই ভাষণ এখনো বিদেশি শিক্ষাবিদ-গবেষকদের আগ্রহের বিষয়। তারা মনে করেন,

বিশ্বমানবতা ও মুক্তির দাবিতে অনবদ্য এই ভাষণ। জাতির স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু কেবল নিজেকে উৎসর্গ করেননি, আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যা সত্যিই বিরল। তাই সংগীতের সুর মূর্ছনা আর শিল্পীর রঙ-তুলি সবখানেই তিনি অসাধারণ। সাহিত্য-সংস্কৃতির মঞ্চেও বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর আগ্রহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি দেশের জাতীয়সংগীত এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' গানটি রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাঙালি কবিদের চোখে বঙ্গবন্ধু সবসময়ই অসাধারণ। কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতায়:

'মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারি বাণ'।

কবি সুফিয়া কামালের লেখায়ঃ

'তোমার শোণিতে রাঙানো এ মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাই তো তোমায় ডাকে বাংলার কানন গিরি ও নদী'।

কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়ঃ

'ধন্য নেই পুরুষ, যার নামের উপর
পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা'।

কবি মহাদেব সাহার কবিতায়ঃ

'আমি আমার বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানি
দশ টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখেছিলাম
বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ'।

সৈয়দ শামসুল হকের লেখায়ঃ

'তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলার পথ চলি।
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি'।

বিদেশি কবিরাও বঙ্গবন্ধুকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। সুইডেন প্রবাসী উর্দুভাষী কবি আসিফ শাহাকরের ভাষায়ঃ

'বঙ্গবন্ধু, এ স্বাধীনতার জন্য অভিবাদন তোমাকে
এ স্বাধীনতার অনেক মূল্য আছে জানি'।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন:

'যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরী, মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

১৯৭১-এর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি ছিল বাঙালির স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। কারণ এই ভাষণ সেদিন গোটা জাতিকে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া সারাদেশের মানুষ হয়ে উঠেছিল লড়াকু সৈনিক। তাদের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না কিন্তু বুকে ছিল অসীম সাহস। স্বাধীনতার জন্য এ জাতি দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে। প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষা করেছে স্বাধীনতার। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– ঠিক তখন থেকেই নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করেছে দেশের প্রতিটি মানুষ। কবি নির্মলেন্দু গুণ তাই যথার্থই বলেছিলেন, 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের'।

লেখক: গবেষক

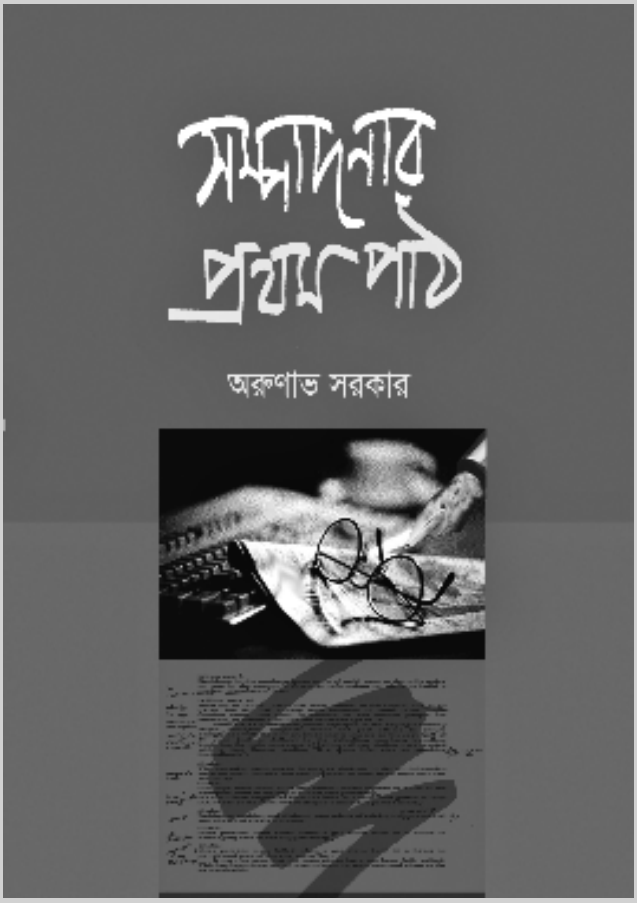

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

‘বঙ্গবন্ধু অনেক বড়ো মাপের মানুষ’

—— কামাল লোহানী

‘মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে আমরা অবিসংবাদিত নেতা হিসেবেই মেনে ছিলাম। মওলানা ভাসানীও বলেছিলেন, এখনকার যে ঝড় উঠেছে, সে ঝড়ের নেতৃত্ব দেবে শেখ মুজিবুর রহমান। একদিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন তিনি। তারপরও তিনি এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেননি– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বড়ো পর্যায়ের নেতা ছিলেন।’ –জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিকব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পক্ষ থেকে গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষার জন্য তাঁর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন পিআইবি-এর সহকারী সম্পাদক **ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস (জ্যোৎস্নালিপি)**।

নিরীক্ষা: নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

কামাল লোহানী: নেতৃত্বের দিক থেকে প্রথম থেকেই তাঁকে আমি বড়ো মাপের নেতা মনে করি। তারপর তো তিনি একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকারী। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। এ দেশে যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যেমন– মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দীও তাঁর পুরধা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে কাজটি করতে পারেননি

কামাল লোহানী

তাঁদের বয়সের কারণে বা সাংগঠনিক কারণেই হোক; তিনি তরুণ বয়স থেকেই সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে দলকে গঠন করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগে পারিণত হলো। সেটাকে তিনি আন্দোলনের একটি বাতিঘরে পরিণত করলেন। জনগণের কল্যাণে সমাজকে মানবিক রূপ দেওয়ার জন্য তিনি এ চিন্তা করেছেন। সে দিক থেকে আমি বলব, নেতা হিসেবে তিনি অনেক বড়ো মাপের। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে আমরা অবিসংবাদিত নেতা হিসেবেই মেনে ছিলাম। মওলানা ভাসানীও বলেছিলেন, এখনকার যে ঝড় উঠেছে, সে ঝড়ের নেতৃত্ব দেবে শেখ মুজিবুর রহমান। একদিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন তিনি। তারপরও তিনি এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেননি– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বড়ো পর্যায়ের নেতা ছিলেন। আরেকটি বিষয় হলো তাঁর বাগবিদগ্ধতা। তিনি যে বক্তৃতাগুলো করতেন, তা সাধারণ মানুষকে বিমুগ্ধ করার মতো এক মোহনীয় চরিত্র ছিল তাঁর ভেতর। তাঁর যে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর– সে কণ্ঠস্বরকে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারে 'বজ্রকণ্ঠ' বলেছিলাম। সে বজ্রকণ্ঠটি সত্যিকার অর্থেই সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করত। '৭০-এর নির্বাচনে পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে দাঁড় করালেন। তখন নেতা হিসেবে সারা পাকিস্তানে তাঁর কোনো জুরি ছিল না।

নিরীক্ষা: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি আছে কি?

কামাল লোহানী: স্মৃতি আছে, আমরা তো একসঙ্গে জেলে ছিলাম। ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলন হয়। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে এম শেখ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের এসেছিলেন ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আইয়ুবি শাসন ব্যবস্থা যাতে তারা গ্রহণ করে, সেই মোসাহেবি করার জন্য। কিন্তু সেখানে ছাত্রনেতারা ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার। তাঁদের কথার জবাব দিতে না পেরে এ দুই সামরিক শাসক পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। পালিয়ে যাওয়ার পরই ছাত্রদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী লে. জেনারেল কে এম শেখ এ অপমান সহ্য করতে পারেননি। পরাস্ত করার জন্য তাদের যে অস্ত্র, সেটা তারা প্রয়োগ করল। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো। এ সময় আমি গ্রেফতার হলাম। আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিষয়টি আমি জানতাম না। বঙ্গবন্ধু আরো আগে গ্রেফতার হয়েছেন। আমি গ্রেফতার হই ১৯৬২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। আমার প্রথম সন্তান ছেলে। তখন তার বয়স ১৩ দিন। ৩০ জানুয়ারি তার জন্ম। আমি তখন দৈনিক আজাদে সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করতাম। রাতের পালায় কাজ শেষ করে আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন রাত আড়াইটা। হঠাৎ আমার রিকশার চারদিকে সিভিল ড্রেসে কিছু লোক ঘিরে ফেলল। পরে আমাকে বলা হলো আপনার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে। তখন আমাকে অ্যারেস্ট করে লালবাগ থানায় নিয়ে গেল। তখন টর্চার সেল একটাই ছিল, লালবাগে। সারা রাত আমার ওপর মানসিক নির্যাতন হলো। ঘুমাতে বলল হাজার হাজার পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে এর মধ্যে, যা অসম্ভব ব্যাপার। তারপর নানা রকমের জিজ্ঞাসা। একজন জিজ্ঞাসা করতে থাকে তো আরেকজন শুরু করে। জবাব দেওয়া যায় না। জবাব যে দেওয়া হচ্ছে না, তার জন্যও অভিযোগ করে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে সকাল ১০টায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ২৬ নম্বর সেলে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আছেন। মজার ব্যাপার হলো, বাষট্টির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যারা অ্যারেস্ট হয়েছেন, তাঁরা সবাই ওখানে আছেন। তাঁর মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হলো তাজউদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মোস্তফা, রণেশ দাসগুপ্ত, ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, শিক্ষামন্ত্রী আবুল মনসুর আহমেদের সঙ্গে। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বাবা পূর্তমন্ত্রী কপিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আওয়ামী লীগ করতেন, উনাকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আরো অনেকে আছেন। শেখ মনি, শাহ মোয়াজ্জেম, নাসিম আলী, হায়দার আকবর খান রনো ছিল। তারা সবাই ছাত্রনেতা তখন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর যে জিনিসটা আমি লক্ষ করেছি, পরমতসহিষ্ণুতা এবং অন্য দলের হলেও তার প্রতি যে মমত্ববোধ, এই যে নেতৃত্বের গুণ মানুষকে গ্রহণ করার, এ জিনিসটা জেলখানায় যওয়ার পর আরো বেশি করে দেখলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে– সাড়ে তিন মাস পর আমি যখন রিলিজ হচ্ছি, আমার রিলিজ অর্ডার আসার পর আমাকে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তুইও চলে যাচ্ছিস।' তখন বঙ্গবন্ধু, রণেশদা আর আমি– এ তিনজন আছি আর সবাই চালান হয়ে গেছে। রণেশ দাশগুপ্ত তো গম্ভীর মানুষ। তাঁর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হইচই করতে পারবেন না, আমার সঙ্গে তো সেগুলো পরতেন। ভেতরে একটা ভলিবল টিম ছিল। ভলিবল টিমে আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে বঙ্গবন্ধু আমাকে ক্যাপ্টেন বলতেন। উনি ওই দলের সদস্য ছিলেন। মিডল ম্যান হিসেবে খেলতেন। উনি খুব ভালো ভলিবল খেলতেন। আরেকটা ঘটনার কথা বলি, হঠাৎ দেখলাম, আমার নামের যে খাতাটা আমার স্ত্রী পাঠিয়েছিলেন, সেটার ভেতর থেকে অনেক পাতা নেই। ওটা সেল সেন্টার পাস করবে সিল দিয়ে। খাতায় কিছু পৃষ্ঠায় লেখা ছিল। যখন আমি দেখছি খাতার ভেতর পাতা নেই, তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ জেলখানায় পাতা হারিয়ে যাওয়া জেল কোডে বেআইনি কাজ। অপরাধযোগ্য কাজ। এর জন্য আমাকে আবার জেল খাটতে হতে পারে। আরো ৭ দিন বেড়ে যেতে পারে। আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম, লিডার আমার তো খাতার ভেতরে পাতা নেই। পাতা নেই? কেন? তুই কি বউমাকে চিঠি লিখেছিস? না আমি যেটা ফর্মালি পাই, ওটাতে লিখি। তাহলে কে নিল। পরে উনি চিন্তাভাবনা করে বললেন, ঠিক আছে। জমাদারকে আমার কথা বল, ডেপুটি জেলার যে থাকবে সে যেন তোর বিছানাপত্র চেক না করে। এরপর উনি ভাবলেন। তাহলে কে নিল। পরে বললেন, বরিশালের নুরুল ইসলাম মঞ্জু বিয়ে করেই জেলে এসেছে। ও এ কাণ্ডটা করেছে। আমরা তো ১৫ দিনে একটা করে চিঠি লেখার কাগজ পেতাম। ফলে ও আমার খাতা থেকে পাতা নিয়ে ইনফর্মাল চিঠি লিখেছে। এটা জেলখানায় মাঝেমধ্যেই হয়। ফলে এটা বের করে ফেললেন। পরবর্তী সময়ে মঞ্জু স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যাঁ, কামাল ভাই, ওটা আমি করেছিলাম। একজন সহবন্দি, তার প্রতি যে মমত্ববোধ, সে যে দলেরই হোক না কেন, এই জিনিসটা সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল। আর এটা বের করা একটা বিচক্ষণতার ব্যাপার। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনার দিকটাও প্রকাশ পায়। জেলখানায় থাকতে উনার সঙ্গে যখন কথা বলতাম, তখন উনি বলতেন সত্যি কথা বলতে, 'পূর্ববঙ্গ যদি স্বাধীন হয়ে যায়, পিআইএ বন্ধ করে দেব। আমাদের ফেডারেল জার্নালিস্ট ছিল পাকিস্তান ফেডারেল জার্নালিস্ট। এটা উনি নির্দেশ করলেন। এ অবস্থার সৃষ্টি হলে তখন তো ডেফিনেন্টলি ওই ব্যানারও ভেঙে যাবে। লিডার আপনি বলছেন, এ অবস্থা হলে ওরা তো সেনা পাঠাবে জাহাজে

করে। উনি বললেন, রাখ ওগুলো। ওগুলো দিয়ে কিছু হবে না। ওরা সাঁতার জানে না। আমরা ডুবিয়ে মারব ওদের। এই যে হালকাভাবে কথাটা বলার ভেতরও যে গূঢ় ইচ্ছেটা প্রকাশ পাচ্ছে– পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করতে হবে, এ জিনিসটা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছিল। আমি নিজে যেহেতু শুনেছি তাঁর কথা, তাই আমি অস্বীকার করতে পারব না। তিনি এটা চাইতেন। সেটাই পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম। তিনি '৭০-এর নির্বাচন করেছেন। নির্বাচন করে তিনি জাতীয় সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তান সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। এটা তাঁর নেতৃত্বের গুণের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। জেলখানায় আরেকটি জিনিস লক্ষ করেছি। ২৬ নম্বর সেলে আমরা আর ৭ নম্বর সেলে ফাঁসির আসামিরা থাকেন। সেখানে ফাঁসির আসামি কারা কারা আছেন, খবর নিতেন। তাদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, এটা নিয়ে তিনি ভাবতেন। অন্য ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে পলিটিক্যাল প্রিজনরা ছিলেন। ১০-১২ বছর তাঁরা আছেন। তাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন। কিন্তু এ কমিউনিস্ট নেতাদের প্রতিও তাঁর যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল, এটারও প্রমাণ পাই। উৎসব-পার্বণে কখনো কখনো দেখা হওয়ার সুযোগ হতো।

নিরীক্ষা: সেসময় আপনি কতদিন ছিলেন জেলে? আর বঙ্গবন্ধু?

কামাল লোহানী: ওইবার ছিলাম সাড়ে তিন মাস। বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন পরে ছাড়া পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় জেলে ছিলেন। ছয় দফার সময় সকালে অ্যারেস্ট করছে, আবার সন্ধ্যায় ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বক্তৃতা করছেন, অ্যারেস্ট হচ্ছেন। এ কাণ্ড তো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ময়মনসিংহে গিয়ে অ্যারেস্ট হয়েছেন। আবার কুমিল্লা, চট্টগ্রাম গিয়ে অ্যারেস্ট হয়েছেন। ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর যে উত্থান, এটা একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে গেছে। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর উনার দাবি ছিল, যেহেতু আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই আমাদের কথা শুনতে হবে। আমাদের ঢাকায় জাতীয় সংসদ আছে। পার্লামেন্ট ভবন আছে। এ ভবনে প্রথম অধিবেশন করতে হবে। মানে ঢাকায় অধিবেশনটা করতে হবে। তারিখও ঘোষণা করা হলো। ইয়াহিয়া খান এটাও বলেছিলেন। এটা বলার পর পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তা গ্রহণ করতে পারেননি। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তিনি মটিভেট করেছেন, তাঁরা যাতে মুজিবের বিপরীতে কাজ করে। সেটা করিয়েছেনও। কিন্তু ওরা সবাই মিলে যখন প্রেস করল ঢাকা অধিবেশন করা চলবে না। জুলফিকার আলী ভুট্টোর ধারণা ছিল, আমরা সবাই ওখানে গেলে আমাদের গলা কাটবে। এটা পলিটিক্যাল চিন্তাধারা না। এটা হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ। এর ভেতর দিয়ে এটা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এ ধরনের কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল, আমরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে জাতীয় সংসদে, তখন সেই অধিবেশন ঢাকা সংসদে হোক। এটার মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ ছিল। সেটা হলো বাঙালি জাতীয়তাবোধ। সে কারণেই তিনি এ দাবি করেছিলেন। কিন্তু এ দাবি নস্যাৎ করে দিল যারা পাঞ্জাবি লীগ ছিল। পাকিস্তানের রাজনীতিকে সবসময় এরা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের যে কোনো দাবিকে দমন করার চেষ্টা করেছে। যার কারণে ২৩ বছর আমরা পরাধীন ছিলাম। এ ২৩ বছরই পাঞ্জাবিদের কারণে দমনপীড়ন, গ্রেফতার, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। ১ মার্চ পাকিস্তান বনাম বিশ্ব একাদশের ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। ওইদিন দুপুরে বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এ খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। স্টেডিয়ামে খবর গেল। সেখানকার সবাই গ্যালারিতে রোদ ঠেকানোর জন্য হাতে নেয়া খবরের কাগজগুলোয় আগুন জ্বালিয়ে মশাল করে। পরে লোকজন বেরিয়ে এলো। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পূর্বাণী হোটেলে। তখন তিনি নির্বাচিত সদস্যদ, নেসেট অ্যাসেম্বলি এবং প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। ঢাকা অধিবেশনে আমাদের কী ভূমিকা হবে, আমরা কী করব, আমাদের করণীয় কী– এ বিষয়গুলো ঠিক করার জন্য তিনি বৈঠক করছিলেন। তখন বিক্ষুব্ধ লোকজন গেল পূর্বাণীতে এবং স্লোগান দিতে থাকল। বঙ্গবন্ধু নেমে এলেন। তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। বক্তব্য দিলেন, ঘৃণা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমরা পরবর্তী কর্মসূচি ৭ই মার্চ ঘোষণা করব। অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করে দিলেন। এর মধ্যে পাকিস্তানিরা আমাদের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে নির্যাতন আরম্ভ করল। মানুষ মারতে আরম্ভ করল। বিভিন্ন জিনিস ধ্বংস করতে লাগল। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দেবেন। উনার ভাষণ দেওয়ার যখন কথা ছিল, তার কিছুক্ষণ পরে এসেছেন। অনেকে মনে করেছে লোকজন হয়নি, সেজন্য। না। লোকে লোকারণ্য তখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। চতুর্দিক থেকে– বাংলা একাডেমির দিক দিয়ে, শাহাবাগ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, প্রেস ক্লাব, কার্জন হলের সামনে, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে মানুষ নানাভাবে আসছে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মানুষ প্লাকার্ড হাতে স্লোগান দিতে দিতে আসছে এবং স্লোগানগুলো কী– 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার-আমার ঠিকানা', 'তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। আমি দেখেছি প্রেস ক্লাব, হাইকোর্টের দিক দিয়ে নৌকার মাঝি বৈঠা নিয়ে আসছে। জিঞ্জিরা থেকে সব মানুষ চলে আসছে। বুড়িগঙ্গায় যারা খেয়া পার করে, তারাও আসছে বৈঠা হাতে। মানুষের এ স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে, সব মানুষ তখন পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে কতটুকু অসন্তুষ্ট। এ সময়ের মধ্যেই তিনি কথাগুলো বললেন। নির্দেশগুলো দিলেন। ব্যাংক ২ ঘণ্টা খোলা রাখবেন। সেনাবাহিনীকে বললেন, তোমরা ব্যারাকে থাকো। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। মনে রেখো যদি অন্যথা হয় তোমরা আমাদের মানুষের ওপর গুলি চালাও, তাহলে তোমাদের কিন্তু ভাতে মারব। পানিতে মারব। এ কথাগুলো তিনি বলেছেন। তাতে তাঁর যে ক্ষোভ, কর্মসূচির যে চিন্তাভাবনা, তা কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি বললেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে তৈরি হয়ে যাও। পাড়ায় মহল্লায় প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোল। পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করবে। শেষ কথাটা উনি বললেন, এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রম। আমি বলি, স্বাধীনতার ঘোষণার কী দরকার। এটাই তো স্বাধীনতার ঘোষণা। আজ যে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। কোনো ব্যক্তি হঠ্যাৎ এসে তো স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন না। দিলে বঙ্গবন্ধুই দিয়েছেন। ৭ই মার্চের এ কথাটাই ঘোষণা। যে নির্দেশনাবলি মানুষকে দিচ্ছেন। যার যা আছে তৈরি হয়ে যাও। প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোল। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। এ কথাগুলোই সেই নির্দেশ, স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য তোমাকে কী করতে হবে। যখন তিনি এ কথা বলছেন, তখন বিশাল জনসমুদ্র স্লোগান দিয়ে উঠছে বারবার।

নিরীক্ষা: একজন সাংবাদিক হিসেবে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিনটিকে আপনি কীভাবে দেখেন? গণমাধ্যম তখন কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিল?

কামাল লোহানী: সত্যি কথা বলতে কী; ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা দিলেন, তখন সেখানে যে বিশাল জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন ভাবলে অবাক লাগে। প্রেস ক্লাব থেকে আমি, বিবিসি করসপনডেন্ট আতাউস সামাদ, চিফ রিপোর্টার সলিমুল্লাহ, কবি মহাদেব সাহা মিলে প্রেস ক্লাব থেকে রেসকোর্স ময়দানে গেলাম। সেখানে গিয়ে যা দেখেছি, এটার শুধু সাক্ষীই নই– তখনকার যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সে আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে, সেটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ক্যারিশম্যাটিক ছিল। বঙ্গবন্ধু গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করতেন। গণমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অসাধারণ।

নিরীক্ষা: মুজিবনগর সরকার গঠনের বিষয়টি যদি বলতেন?

কামাল লোহানী: ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলো। অপারেশন সার্চলাইট পাকিস্তান আর্মি শুরু করল। দৈনিক পাকিস্তানের সামনে ট্যাঙ্ক এসে রইল। আমাদের দিকে রকেট ছুড়ল। আমাদের নিউজ টেবিল, দেওয়াল এবং জালানা ভেঙে গেল। এগুলো আমরা লক্ষ করছি। ২৫ মার্চের পর যখন ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠন হলো, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যেহেতু তিনি পাকিস্তানের কারাগারে, তাই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/উপরাষ্ট্রপতি হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মন্ত্রিসভায় ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান থাকলেন। সেনাপ্রধান থাকলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। এটা হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন, তার প্রমাণ এই জায়গায়। আমি তখনো দৈনিক পূর্বদেশে কাজ করছি। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো। সেখানে প্রফেসর ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন টাঙ্গাইলের নির্বাচিত আবদুল মান্নান। বক্তৃতা করলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ। সেখানে গার্ড অব অনার দিলেন এসপি মাহবুব। সেটা প্রচার হলো আকাশবাণীতে। আকাশবাণী সংবাদ সমীক্ষায় উপেন তরফদার এ সংবাদ সমীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি ওইদিন এটা ধারণ করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা প্রচার করলেন। প্রচার

করার আগে আকাশবাণীতে বারবার ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে– আপনারা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনতে পারবেন। বারবার এটা উচ্চারণ করা হচ্ছিল। তখনও আমরা বুঝতে পারিনি কী হবে, কারণ রেডিওতে কখনো এ ধরনের ঘোষণা আসে না সাধারণত। তারপর হঠাৎ করে একসময় সংবাদ সমীক্ষা প্রচার হচ্ছে এবং তাতে প্রথমেই গান– 'একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠধ্বনি। আকাশে-বাতাসে...।' এ গানটি লিখেছেন গৌরি প্রশন্ন মজুমদার। সুর দিয়েছেন অংশুমান রায় এবং গেয়েছেন অংশুমান রায়। এটা কলকাতা আকাশবাণী থেকে প্রচার হলো। তখন স্বাধীন বাংলা বেতার বিক্ষিপ্তভাবে আছে।

নিরীক্ষা: ১৯৭১ সালের দু-একটি ঘটনা যদি বলতেন?
কামাল লোহানী: এটা যখন প্রচার হলো, তখন আমরা সবাই টেবিলে অজান্তেই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে উঠলাম। তখন কিন্তু জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার মতো অবস্থা নেই দেশে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে উঠল। আমরা এ অনুষ্ঠান শুনলাম। আর আলবদর নেতা চৌধুরী মঈন উদ্দিন যে আমাদের একজন রিপোর্টার ছিল দৈনিক পূর্বদেশের, সে ওখানে উপস্থিত ছিল। এ দৃশ্য দেখে তার চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তখন আমরা ভাবিনি কে কি করছে না করছে। ১৪ এপ্রিলে আমরা নববর্ষ উদযাপন করেছিলাম। গুড়ের পায়েস রান্না করে সবাইকে আমরা খাইয়েছিলাম। ওই বিল্ডিংয়ে তিনটি কাগজ ছিল। ডেইলি রোজনামা ওয়াতান নামে উর্দু পত্রিকা, পাকিস্তান অবজারভার, আর দৈনিক পূর্বদেশ। সাপ্তাহিক চিত্রালী ছিল। আর উর্দু সাপ্তাহিক চিত্রালী ছিল। প্রেসের লোকসহ এখানকার সবাইকে আমরা গুড়ের পায়েস খাইয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করেছিলাম। এ জিনিসগুলো তখন আমাদের ভেতর কাজ করত। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এগুলো প্রকাশ করতে পারতাম না। সব জায়গায় তো আমরা সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজি ছিলাম না। না হলে আকাশবাণীর খবরটা শুনতে পেতাম না। আমরা আকাশবাণী ও বিবিসি শুনতাম। ওখানে কী নিউজ যেত না যেত, সেগুলো আমরা শুনতাম। তারপর আমি ৭ মে ওখান থেকে চলে গেলাম। পরে ২৫ মে আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে জয়েন করলাম। আমাকে নিউজের দায়িত্ব দেওয়া হলো। পাঁচজনকে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল।

নিরীক্ষা: সেসময় বঙ্গবন্ধুর সংবাদগুলো গণমাধমে কীভাবে প্রকাশ করতো?
কামাল লোহানী: বয়সের কারণে আমার সবটা ঠিক খেয়াল নেই এ মুহূর্তে। আমি তখন পূর্বদেশে কাজ করি। রাতের সিফটে। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু এটা বেশি বড়ো করা যায়নি। কারণ ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সম্ভবত টেলিফোনে নির্দেশ ছিল এটা ছাপা যাবে না। এ রকম একটা ব্যাপার ছিল। আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমরা চেয়েছি এটা প্রকাশ করা হোক। সত্তরের ঘূর্ণিঝড় হলো, তখন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ অঞ্চলের দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন ত্রাণ বিতরণের জন্য। মওলানা ভাসানী ফিরে এসে পল্টন ময়দানে একটি মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিং দেখে কবি শামসুর রাহমান একটি কবিতা লিখেছিলেন– 'সফেদ পাঞ্জাবি'। কী অসাধারণ বক্তব্য তাঁর। তখনকার দিনে বঙ্গবন্ধুর যে মানুষের প্রতি দরদ তা তখন প্রকাশ পেয়েছে। দুর্গত এলাকার মানুষ নানা রকম দুর্ভোগের ভেতরে জীবন কাটাচ্ছে। সেখানে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু ত্রাণ বিতরণের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। আমি তখন স্বাধীন বাংলা বেতারে নিউজ এডিটরের দায়িত্বে ছিলাম। বাংলা, ইংরেজি, উর্দুতে আমরা যে নিউজ করতাম, আমাদের সেই নিউজের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ প্রচার করেছি। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের সে কথাগুলো নিউজের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যা ছিল অসাধারণ অবদান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের।

নিরীক্ষা: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাংবাদিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের জায়গটা কেমন ছিল?
কামাল লোহানী: আমাদের যারা গুরুজন যেমন– ফয়েজ আহমেদ, এ বি এম মূসা, এম আর আক্তার মুকুলদের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। সেক্ষেত্রে আমাদের সমবয়সি যেমন– শহিদুল হক ও আমার সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। আমি তাঁর রাজনৈতিক দলীয় যে আদর্শ তাঁর সঙ্গে একমত ছিলাম না, তারপরও আমি তাঁকে লিডার বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে ক্যাপ্টেন বলে সম্বোধন করতেন। এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক– নিজের দলের লোক নয়, তারপরও সে সম্পর্কটা ছিল। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এটা বিরাট গুণ। অন্যকে সহ্য করা, অন্যের মতকে সহনশীল হিসেবে দেখা– এ গুণ ছিল বলেই তিনি একজন মহান নেতা হতে পেরেছিলেন।

নিরীক্ষা: ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির কথা আপনার মনে আছে?
কামাল লোহানী: আমার পরম সৌভাগ্য উনি এলেন ১০ জানুয়ারি, তখন আমি বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক। আমার সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী আশরাফুল আলী খান। তেজগাঁও বিমানবন্দরে প্লেনটা এসে নামল, আমরা ওটার ধারাবিবরণী দিলাম। ওখান থেকে আমার আসার কথা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে; কিন্তু রাস্তার অবস্থা এমন– লোকে-লোকারণ্য। বাড়িঘরে লোক, গাছে গাছে লোক। রাস্তায় লোক। বঙ্গবন্ধুকে একটা ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ট্রাকটা দেখলে বোঝা যায় একটা সমুদ্রের মধ্যে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। এই যে বঙ্গবন্ধু ফিরলেন। ফেরার পর তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, দেশের মানুষ যে আত্মত্যাগ করেছে, নির্যাতন সহ্য করেছে– এসবকিছুর জন্য তিনি জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাধুবাদ জানিয়েছেন। অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তিন বছর সময় চাইলেন এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলা এবং তাঁর যে স্বপ্ন-সাধ, দেশকে সোনার বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য। এটা করতে তিন বছর সময় আমাকে দিতে হবে– এ কথাটা আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত যে দেশ, তাকে তৈরি করতে তো সময় লাগবেই। নতুন দেশ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিরোধিতা করেছে। তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। যারা বন্ধু আছে, তারা তো আমাদের পাশে থাকবেই। বন্ধুত্বের সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এ জাতীয় দেশগুলো থেকে। মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের সহায়তা করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে নিয়ে আসার পেছনে তারা যে প্রেশার ক্রিয়েট করেছিল জাতিসংঘ ও পাকিস্তানের ওপর, সেসব দেশের প্রতি আমাদের তো একটা কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলই। এই যে তিন বছরের কথা তিনি বললেন, তাঁর মাথায় অনেক কিছু খেলেছিল। যেমন– বাকশাল তৈরি করলেন। সব শক্তিকে এক জায়গায় করে দেশটা গড়ে তুলতে হবে– এটাই তাঁর চিন্তা ছিল।

নিরীক্ষা: গণমাধ্যম নিয়ে তাঁর কী চিন্তা ছিল?
কামাল লোহানী: তিনি চারটি কাগজ রেখে মানে দুটি ইংরেজি আর দুটি বাংলা কাগজ রেখে নিউজপেপার অ্যাডালমেন্ট অর্ডার দিয়ে অন্য কাগজগুলো বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দিলেন এজন্য যে, গণমাধ্যমকে একটা ঐক্যবদ্ধের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তার যে চিন্তা ছিল বাকশালের চিন্তা। এটাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কীভাবে থাকবে, সেটার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন ফ্রন্ট থাকবে যেমন– যুব ফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্ট, মহিলা ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট, কৃষক ফ্রন্ট। এ ফ্রন্টের প্রত্যেকের একটা করে সাপ্তাহিক পত্রিকা থাকবে। এটা বহু পৃষ্ঠা। স্যোশালিস্ট ক্যান্ট্রিগুলোয় যেমন হয়। ওই কাগজগুলোর চিন্তাভাবনা উনার মাথায় ছিল। সব পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় অনেক সাংবাদিক যে বেকার হয়ে গেলেন, আমরা এটার প্রতিবাদ করেছি। আমি তখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তখন আমাদের মধ্য থেকে ২৫৬ জন পরে আরো অনেকে বাকশালে যোগদান করেছিলেন। আমরা কয়েকজন করেনি। আমি ও নির্মল সেন এ দুজন করেনি। আমাদের যুক্তিটা ছিল– যখন শ্রমিক ফ্রন্ট হবে, তখন তো আমরা ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ওই ফ্রন্টের মেম্বার হব। এটাই ভদ্রচিত হবে। যা হোক। এটা হয়নি। তাঁর চিন্তা ছিল এসব কাগজের বেকার সাংবাদিকদের কাজে লাগানো হবে। এটা কাজে লাগানোর আগ পর্যন্ত তাদের নানা জায়গায় চাকরি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। সেটা আমি অনেক জায়গায় দেখেছি।

নিরীক্ষা: পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে-বিপক্ষে মত তৈরি হয়েছিল, এটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
কামাল লোহানী: আমি যেহেতু ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, সে হিসেবে দেখেছি। আমি একটা ব্যক্তিগত কথা বলি। আমি একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। নাজিমুদ্দিন মানিক নামে আমাদের এক বন্ধু ছিলেন, সহকর্মী ছিলেন দৈনিক পূর্বদেশে। তার যাতায়াত ছিল ওখানে। বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়াটা খুব সহজ ছিল আমাদের জন্যে। ও যেত। আমি বলেছিলাম, তুমি চিরকুটটা বঙ্গবন্ধুর হাতে কাল পৌঁছে দিও। ২৪৬ জন দুপুরে বাকশালে যোগদান করতে যাবে। তার আগেই এটা পৌঁছানো দরকার। আমি তাতে লিখেছিলাম, যারা জয়েন করতে যাচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

সাংবাদিক কেউ নেই। তাদের গ্রহণ না করার জন্য। ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট যখন হবে, তখন আমরা সাংবাদিকরা এর সদস্য হব। এটাই ভদ্রোচিত হবে। এভাবে লিখেছিলাম। এটা পৌঁছায়নি তাঁর কাছে। আমাদের বন্ধুরা গিয়ে জয়েন করেছিল। পরে অনেকেই জয়েন করেছেন। যখন দেখলাম এটা হচ্ছে, তখন আমরা ইউনিয়ন থেকে বললাম, আপনারা যারা জয়েন করতে চান, তারা জয়েন করেন। আমরা করব না। আমরা চারজন– আমি, নির্মল সেন, গিয়াস কামাল চৌধুরী ও রিয়াজউদ্দিন আহমেদ। এ চারজন রিয়াজউদ্দিনের বাসায় বৈঠকে বসলাম। বৈঠকে চট্টগ্রাম ইউনিয়নের সেক্রেটারি মফিজউদ্দিন আহমেদও এলো। সে বলল, আমি জয়েন করে এসেছি। আপনারা চারজন একই সিদ্ধান্ত নিন। জয়েন করলে চারজন করেন, না করলে কেউ নয়; কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত পারলাম না। গিয়াস কামাল চৌধুরী যদিও সে এন্টি আওয়ামী লীগ, তারপরও সে জয়েন করে ফেলল। রিয়াজউদ্দিন বলল আমি জয়েন করব। উনি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, আমি জয়েন করব। আমি এবং নির্মল সেন করলাম না। এবং নির্মল সেন একটা পার্টি করতেন। পার্টির অনুমতি ছাড়া তো তিনি করতে পারবেন না। এজন্য তিনি করবেন না। আর আমি বললাম, আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করি না। এজন্য করব না। আমরা দুজন করলাম না। ওই যে খবরের কাগজের লোকগুলো যারা বেকার হয়ে গেল, তাদের তালিকা তৈরি হলো এবং এ তালিকার ভিত্তিতে বিভিন্নজনকে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি দিতে আরম্ভ করল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই হলো।

নিরীক্ষা: এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?
কামাল লোহানী: আমরা যখন জানতে পারলাম বিভিন্ন ফ্রন্টের যে পেপারগুলো হবে, সেগুলো বহু পৃষ্ঠার কাগজ হবে। সেখানে অনেক সাংবাদিককেই তারা কাজে লাগাতে পারবে। বঙ্গবন্ধু বাকশাল করেছিলেন, কাগজ বন্ধ করেছিলেন, তবে বেকার সাংবাদিকদের চাকরির কথা তিনি চিন্তা করেছেন। সাময়িক সংস্থান এবং স্থায়ী সংস্থানের কথা চিন্তা করেছেন। আমরা তখন কঠোর সমালোচনা করেছি। ইউনিয়ন থেকে প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তাঁর যে চিন্তা ছিল, সে চিন্তা তো কাজে লাগাতে পারলেন না। তার আগেই তাঁকে হত্যা করা হলো।

নিরীক্ষা: বঙ্গবন্ধুর শাসনকালকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
কামাল লোহানী: দেশ পরিচালনার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছিলেন, সেটা একটি স্বাধীন দেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে যে মানুষগুলো গ্রহণ করেছিল, তারা তাঁর কাছ থেকে যা কিছু আশা করেছিল, সেটা হলো– জনগণের কল্যাণ। সেই জনগণের কল্যাণের জন্যই তিনি তিন বছর সময় চেয়ে নিয়েছিলেন।

অনেক কাজ তিনি করেছেন বিভিন্নভাবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা নিয়ে বাকশাল করেছিলেন। সেটা পরবর্তী সময়ে কী হতো, সেটা আর জানতে পারলাম না। ১৫ই আগস্ট তাঁকে হত্যা করা হলো। যে সময় পাওয়ার কথা ছিল, তা তো পেলেন না তিনি। তিনি একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যে সময় পেয়েছিলেন, সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন। যেমন, একটা পলিটিক্যাল ক্যারেক্টর তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আমাদের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে আনার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন– আমাদের বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন মোস্তফা নুরুল ইসলামকে নিয়ে এলেন মহাপরিচালক করে, উনি বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। উনি বললেন, নেতা আমাকে কেন শিল্পকলা একাডেমির মাহাপরিচালক করলেন? বঙ্গবন্ধু বললেন, তুই নাটকের লোক। সুতরাং তুই সবকিছু মিলিয়ে একটা চিন্তাভাবনা করতে পারবি। বাংলা সংস্কৃতির মানুষ তুই, সুতরাং সেই জিনিসটা তুই করতে পারবি। সেজন্যই তোকে নিয়ে আসা। তারপর ড. সিরাজুল ইসলামকে নিয়ে এসেছেন। ইতিহাসের লোক। তিনিও কিছুদিন মহাপরিচালক ছিলেন। পরে প্রফেশনাল লোক এসেছে। বঙ্গবন্ধু চলে যাওয়ার পর নানা জন নানা রকম করেছেন। এফডিসি চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের সূচনালগ্নে বঙ্গবন্ধু শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। সেই যুক্তফ্রন্টের আমলে। সেই সময় এফডিসির গোড়াপত্তন। পরবর্তী কালে যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন হলো। টেলিভিশনকে আরো উন্নত করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই তিনি পরিবর্তন এনেছিলেন।

নিরীক্ষা: '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো। এরপর ১৬ই আগস্টে পত্রপত্রিকা কেমন ভূমিকা রেখেছিল?

কামাল লোহানী: পত্রপত্রিকার ভূমিকা রাখার মতো কোনো সুযোগ ছিল না। তখন তো রীতিমতো মার্শাল ল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। আমাদের অস্তিত্বই থাকে না। কাগজের ডিক্লারেশন থাকবে না। হত্যাকাণ্ডের খবর ওরা যেভাবে দিয়েছে, সেভাবেই ছাপতে হয়েছে। তখন প্রেস নোট ছাপতে হতো। আমাদের সময় আমরা কৌশল করে একটা প্যারা ছেপে বাকি অংশ আগামীকাল সমাপ্ত– এভাবে ছেপে দিতাম। পরে আর ছাপতাম না। এরকম। পরে আবার এমন অবস্থা হলো যে, বলল প্রেস নোট পুরো ছাপতে হবে। ওরা বুঝে ফেলল আমাদের কৌশলটা।

নিরীক্ষা: '৭৫-এর কত পরে বঙ্গবন্ধুর নিউজ পত্রপত্রিকায় আসতে শুরু করে?
কামাল লোহানী: এগুলো অনেক পরে, যা সঠিকভাবে আমার মনে নেই। '৭৫-এর পরে গণমাধ্যমের অবস্থা একেবারে **খারাপ** ছিল। গণমাধ্যমকে নির্ভর করতে হতো সরকারি হ্যান্ড আউট, প্রেস নোট এসবের ওপর। যে নিউজগুলো ছাপতে হতো, সেন্সরশিপের মধ্য দিয়ে ছাপতে হতো। যেমন– আমি একটা লিখলাম; কিন্তু আমার চিফ ইনচার্জ সেটা কেটে দিল, এগুলো দিও না। এগুলো দেওয়া যাবে না। নির্দেশই যথেষ্ট। একটা দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে যে, ১৫ই আগস্টের পর মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথা বলেনি কেউ। প্রতিবাদ কেউ করতে পারছে না। কিন্তু এ প্রতিবাদের শব্দ উঠেছে কোনো কোনো জায়গা থেকে। সেগুলো কাগজের ওপর যে শাসন ছিল, সে শাসনের কারণে খবরের কাগজে এগুলো আসেনি।

নিরীক্ষা: বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আসলে কী?
কামাল লোহানী: বঙ্গবন্ধুর আদর্শ রাজনৈতিকভাবে চিন্তাভাবনা করলে এটা হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদটা হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো আদর্শ। দেশপ্রেম, জাতিত্ববোধ, সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করা– এটাই তাঁর আদর্শ। একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর কতখানি আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, যে মানুষটি বলেছেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই কথাটি বঙ্গবন্ধু মনে রেখেছেন অক্ষরে অক্ষরে। সেজন্য মানুষের ওপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছেন সব সময়। এটাই তার সবচেয়ে বড়ো আদর্শ। এটি যে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, জাতিত্ববোধ, বাঙালিত্ব– এটাই তাঁর বড়ো গৌরব, গর্ব, অহংকার– এটা তাঁর দর্শন।

নিরীক্ষা: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
কামাল লোহানী: আপনাকেও ধন্যবাদ।

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত ছিলেন না

স্বদেশ রায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে অনির্বাচিত কিছু রাজনৈতিক শক্তির সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। আর ওইসব বিপ্লবের নেতার কাজের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কাজকে তুলনা করে তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। যারা মনে করেন বা বলেন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, তারা হয়তো কিছু সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তুলনা করে বিচার করেন মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। বিষয়টি একজন সাধারণ সৈনিকের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির মতো। এমনকি সশস্ত্র বিপ্লবের নেতা বেন বেল্লাও ফ্রান্সের জেলে বন্দি ছিলেন। তাকেও বলা হয় না তিনি তার দেশের সশস্ত্র বিপ্লবে অনুপস্থিত ছিলেন। এমন উদাহরণ মনে করেও তারা কোনো সামগ্রিক বিচার করেন না। এছাড়া কখনোই তারা বিচার করেন না প্রকৃত অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র কী? আর চরিত্র উপলব্ধি করতে গিয়ে বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা ভুল করেন। বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধটির চরিত্র কী? বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ২২ বছরের আর মুক্তিযুদ্ধ নয় মাসের। এ নয় মাসের যুদ্ধের আগের যে ২২ বছরের মুক্তিসংগ্রাম, সেটা ছিল ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার একটি সংগ্রাম। আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ হলো স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে থাকা বিদেশি

হানাদার বাহিনী বিতাড়নের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শুরু হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে। বাস্তবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার মুহূর্ত থেকে। এ স্বাধীনতা ঘোষণার মুহূর্তেই হানাদার বিতাড়ন শুরু হবে, সেই প্রস্তুতিতে দেশকে বঙ্গবন্ধু তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নিয়ে এসেছিলেন।

স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার গঠিত হয়। ওই নির্বাচিত সরকারের অধীনে স্বাধীন দেশের অভ্যন্তর থেকে বিদেশি হানাদার শত্রু বিতাড়নের যুদ্ধটিই ছিল আমাদের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ। অর্থাৎ হানাদার বাহিনী বিতাড়ন করার যুদ্ধ ২৬শে মার্চ এ স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে শুরু হয় আর বিতাড়ন করতে নয় মাস সময় লেগেছিল ওই শত্রুদের। ১৬ই ডিসেম্বর তাদের আমরা বিতাড়ন করতে সক্ষম হই বলেই এই দিনটি আমাদের বিজয় দিবস। কোনো অনির্বাচিত সশস্ত্র শক্তি যদি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করত, তাহলে ১৬ই ডিসেম্বরই হতো আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আর এখানেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র উপলব্ধির মূল বিষয়টি থেকে যায়।

২৬শে মার্চ বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, ওই ঘোষণাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ভিত্তিভূমি, যা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের এ অংশ উল্লেখ করলেই স্পষ্ট হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে:

'যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্যে আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং আমরা তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম...

অর্থাৎ ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে ভিত্তি ধরে ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্র বা বাংলাদেশের সংবিধানের মাতৃকোষ ঘোষিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত ও অনুমোদিত, তাই এটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান না হলেও সংবিধানের ভিত্তিমূল, যাকে তুলনা করা যেতে পারে একটি সন্তান জন্মের মাতৃজনন কোষের সঙ্গে। তাই এককথায় এ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে আমরা আমাদের দেশের ভিত্তি সংবিধানের মাতৃকোষ বলতে পারি। আর এ ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল, ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে একটি বৈধ সরকার গঠন করে হানাদার বিতাড়নের মুক্তিযুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত সংসদীয় নেতা বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলে। নির্বাচিত নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলেই সংবিধানের মাতৃকোষ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি করেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে আর সেই সংসদে (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে গণপরিষদ গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেটাই সংসদের বা গণপরিষদের সিদ্ধান্ত) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা অনুমোদন করেন। এই ঘোষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে ওই মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনা সম্ভব হয়নি ঠিকই, তবে ১৯৭১ সালে নয় মাস বাংলাদেশে যে যুদ্ধ ছিল তাকে সাংবিধানিক সরকারের অধীনের যুদ্ধ হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল দেশ ও বিদেশে। প্রমাণিত হয়েছিল নির্বাচনের ভেতর দিয়ে আসা একটি স্বাধীন দেশের সব মানুষ এই যুদ্ধ করছে। আর সে যুদ্ধটি শুরু হয়েছে তাদের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈধ ঘোষণার ভেতর দিয়ে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আরো কয়েকটি দিক এখানে লক্ষ করা দরকার– ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বরের ভেতর অনুষ্ঠিত যে নির্বাচন হয়, ওই নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে তাদের সংসদীয় নেতা ও দেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ ১৯৭০-এর নির্বাচনে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে দল ও নেতাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, সেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের রায় পাওয়া নেতাই এখানে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হচ্ছেন। তাই সত্তরের নির্বাচনের জনগণের রায় হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার ঘোষণা মূল ভিত্তিভূমি আর তার নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু। সত্তরের নির্বাচন হয়েছিল ছয় দফার ভিত্তিতে। সে কারণে সহজেই ওই নির্বাচনের ভেতর দিয়ে আসা নেতা পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বসেও এই স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এখানে ছয় দফার বিস্তারিত আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। তবে তাতে এই নিবন্ধের কলেবর অনেক বড়ো হয়ে যাবে। তাই খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে ছয় দফা সম্পর্কে বলা যায়, ছয় দফা ছিল এই নির্দিষ্ট ভূসীমার ওপর অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের সনদ। জনগণ সেই অধিকারের পক্ষে রায় দিয়েছিল। এ কারণে যখন দেখা গেল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বসে জনগণের এই রায় বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, কাঠামো ভেঙে নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থান দরকার, তখন জনগণের নির্বাচিত নেতা স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। আর সে কাজটি তিনি বৈধভাবে করতে পারলেন। একারণেই সেই স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করতে গিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, পাকিস্তানে একটি সরকার গঠন করার জন্যে তাঁদের শেষ চেষ্টাটি পর্যন্ত তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু জনগণের হয়ে জনপ্রতিনিধিদের সেই সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। বরং তাদের ওপর অবিচারমূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ইয়াহিয়া। এই গণহত্যা শুরু ও যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার পরেই বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসেবে ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে সবাইকে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ দেন, আর সেটাকেই স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে সব জনপ্রতিনিধি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে বৈধ ঘোষণা হিসেবে অনুমোদন দেন। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীন দেশের

জন্য সরকার গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুকে ওই সরকারের প্রধান অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বৈধ সরকার তখন দেশের ওপর ওই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সব আইন প্রণয়ন ও রাজস্ব সংক্রান্ত সব অধিকার পায়।

অর্থাৎ ২৬শে মার্চ যে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষিত হয়, ওই রাষ্ট্রটি ১০ এপ্রিল থেকে তাদের সংবিধান ও বৈধ সরকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। রাষ্ট্রটির জন্য তখন পথ চলতে দুটি বাধা থাকে। এক. রাষ্ট্রটির অভ্যন্তরের বেশকিছু স্থান তখনো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দখল করে রেখেছে। দুই. রাষ্ট্রটির জন্য অন্য রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দরকার। এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য দুটি বিষয় জরুরি ছিল। এক. যারা এই রাষ্ট্র গঠন করেছে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, এটা প্রমাণ করা। দুই. রাষ্ট্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কি না? কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অন্য একটি গণতান্ত্রিক নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে গেলে প্রথমেই দেখতে হয় যারা নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছেন বলে দাবি করছেন, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী কি না? যদি তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রমাণিত না হয়, তাহলে স্বীকৃতি পাওয়ার ৭০ ভাগ শর্ত তারা পূরণ করে। আর এখানেই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণার পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ রণকৌশলটি গ্রহণ করার কাজ। অর্থাৎ নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রমাণ করতে হবে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে তারা যে থাকতে পারছে না এর জন্য পাকিস্তান দায়ী, বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশ একটি বৈধ স্বাধীন রাষ্ট্র, এটা পাকিস্তানের ভেতরে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন নয়। বরং পাকিস্তানই তার পূর্ব অংশের সমাপ্তি টানার সব পথ করে দিয়েছে।

এ কারণে স্বাধীনতা ঘোষণার পরে বঙ্গবন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ায় কূটনৈতিক যুদ্ধে পাকিস্তানকে হারানোর বিষয়টি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর এই নিয়মতান্ত্রিক কূটনৈতিক যুদ্ধটি বঙ্গবন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে পাকিস্তানি হানাদার বিতাড়নের যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যদি ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতেন বা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মতো যুদ্ধ পরিচালনা করার চেষ্টা করতেন, তাহলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রমাণ করার যথেষ্ট সুযোগ পেত। তারা তখন বলত, শেখ মুজিব তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ না করে দেশকে সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তারা তখন আবার আলোচনার আহ্বান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে লক্ষ্যচ্যুত করার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার কৌশল নিত। তাদের সে সুযোগ বঙ্গবন্ধু দেননি। বঙ্গবন্ধুকে অনেকে আত্মগোপনে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ভুল করেননি। তিনি তাঁর দেশ আক্রান্ত হওয়ার পরে নিজ বাসভবন, যা তখন তাঁর অফিস হিসেবেও ব্যবহৃত হতো, সেখানে বসেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁর মানুষকে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর দেশের স্বীকৃতি চান। অর্থাৎ গোটা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করল বাঙালির নির্বাচিত নেতা স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটালেন প্রকাশ্যে বসে এবং ওই দেশটির জন্য তিনি বিশ্বের সব দেশের কাছে ও জাতিসংঘের কাছে স্বীকৃতি চাওয়ার কাজটিও করলেন প্রকাশ্যে। তাই পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যদের দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করান, তখন বঙ্গবন্ধু আর পাকিস্তানের কোনো নেতা নন। তিনি একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান, যা বাংলাদেশের সংবিধানের মাতৃকোষে ১৭ এপ্রিল অনুমোদন করা হচ্ছে। তাই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার ভেতর দিয়ে একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকারপ্রধানকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ। এই গ্রেফতার করার কোনো বৈধ ও আইনগত অধিকার তখন তাদের আর ছিল না। যে কারণে এই গ্রেফতারের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রমাণিত করে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর এই প্রকাশ্যে গ্রেফতার হওয়ার ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের সরকারপ্রধান কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর নেতা নন। শুধু তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার ভেতর দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে এটাও প্রমাণিত হয় যে, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার কারণে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ঢাকার বদলে মুজিবনগর থেকে তাঁদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই ভারত যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সুযোগ পায়, তারও বৈধতা আসে এ কারণে যে বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার দ্বারা ঘোষিত কোনো দেশ নয়। এটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের দেশ। বিচ্ছিন্নতাবাদী এখানে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ। যে কারণে বিশ্বের সব থেকে বড়ো সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে নৈতিকভাবে প্রতিবেশী একটি গণতন্ত্রকামী জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করার সময়ে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার অধিকার পায় ভারত। তাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ভারত যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সহযোগিতা করেছিল এবং এদেশের এক কোটি মানুষকে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দিয়েছিল, তা নিয়ে হাজার অপপ্রচার করলেও কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নৈতিক সমর্থন পাকিস্তান পায়নি। বরং ভারতের জনগণের পাশাপাশি বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার পরে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের সমর্থন পাওয়াই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৭০ ভাগ কাজ। গোটা মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের নেতা বঙ্গবন্ধু তাই একা কতটুকু করেছেন– এ আলাদা করার চেষ্টা একটি বোকামি হবে। তবে মুক্তিযুদ্ধের এই ৭০ ভাগ বিজয় অর্জন হয় মূলত বঙ্গবন্ধু কূটনীতিতে ইয়াহিয়াকে পরাজিত করার ফলে। কারণ তিনি যদি নিশ্চিত মৃত্যু বা ফাঁসির ঝুঁকি না নিতেন, তাহলে ইয়াহিয়া কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রমাণিত হয় না।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আরো কয়েকটি দিক এখানে লক্ষ করা দরকার– ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বরের ভেতর অনুষ্ঠিত যে নির্বাচন হয়, ওই নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে তাদের সংসদীয় নেতা ও দেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করেছেন

আর গ্রেফতার হওয়ার ভেতর দিয়ে যে আন্দোলন-সংগ্রাম বা যুদ্ধ থেকে কোনো নেতা অনুপস্থিত থাকেন না এর প্রমাণ বিশ্বে ভূরি ভূরি। উদাহরণ হিসেবে বেন বেল্লা আছেন, ম্যান্ডেলা আছেন। সর্বোপরি এর আগেও বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলার ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন, একজন নেতা কীভাবে জেলে থেকে আন্দোলনের মূল নেতা হতে পারেন। ওই মামলায়ও তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ওই মামলার ভেতর দিয়ে বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চাহিদা জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'কে পাকিস্তান যতই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিল, ততই পূর্ব পাকিস্তানে আত্মনিয়ন্ত্রণের চাহিদা জাগ্রত হয়েছিল। সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের নেতা হিসেবে দেশের মানুষের কাছে একক হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই সময়ে যা ছিল দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিতে সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়। যে কারণে তিনি যখন জেলে যান, তখন জেলে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত নেতা শেখ মুজিব বা শেখ সাহেব হিসেবে। আর মানুষের আন্দোলন শুধু নয়, গণঅভ্যুত্থানের ফলে যখন আইয়ুবশাহী তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়, তিনি তখন বিশাল দীর্ঘদেহী এক নেতা। যে নেতাকে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুজিবভাই বা শেখ সাহেবের ভেতর ধারণ করে না। মানুষ তাই তখন তাঁর মাপের অভিধায় তাঁকে ডাকল, তিনি ভূষিত হলেন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে।

১৯৭১ সালের নয় মাসেও পাকিস্তানের জেলে যাওয়ার ভেতর দিয়ে তিনি যেমন ৭০ ভাগ যুদ্ধে জিতিয়ে দেন বাঙালিকে, তেমনি নয় মাসের জেলে বসেও তিনি আগরতলা মামলায় জেলে থাকার মতো নিজেকে রূপান্তরিত করেন আরো বিশাল হিসেবে। আগরতলা মামলা থেকে যখন বঙ্গবন্ধু বের হয়ে আসেন, তখন তাঁর দেহ অনেক দীর্ঘ, তখন তাঁকে ধারণ করার জন্য 'বঙ্গবন্ধু' উপাধির প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া ওই আগরতলা মামলায় জেলে থাকার ভেতর দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান থেকে তিনি শুধু বঙ্গবন্ধু হননি, তাঁকে জেলে নিয়ে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করে শুধু আইয়ুবের পতন ঘটেনি, এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে স্লোগান ওঠে– 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'।

এরপরও সত্য হলো, সামরিক শাসকরা কখনোই জনগণের নেতার শক্তি বুঝতে পারে না। এমনকি তারা নেতার আকৃতিও বুঝতে পারে না। যে কারণে তারা ১৯৭১ সালে আরো বড়ো আকৃতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। তারা গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে। এমনকি তারা এটাও বুঝতে ব্যর্থ হয়, বঙ্গবন্ধুর আকৃতি আর বাংলাদেশের আকৃতি তখন সমান হয়ে গেছে। একটি দেশকে অন্য দেশের কারাগারে কোনোমতেই রাখা যায় না। ইয়াহিয়া যখন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ওই সময়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক শব্দ। বঙ্গবন্ধু তখন বাংলাদেশের মানচিত্রসহ সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমান আকৃতির। এ কারণে ইয়াহিয়া যদিও বঙ্গবন্ধুকে জেলে নিয়েছিলেন, তবে বাস্তবে তারা গোটা বাংলাদেশকে তাদের পাকিস্তানের জেলে ভরতে গিয়ে বস্তুত বাংলাদেশকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলে, নির্বাচিত নেতাকে গ্রেফতার করার অধিকার পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের নেই। তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের পক্ষ নিলেও তার সিনেটে তিনি বারবার বাধাগ্রস্ত হন পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থনের বিল আনতে এবং সেদিনের পত্রপত্রিকার খবরগুলো দেখলে আজকের তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারবে, বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারকে সেসময়ে অনেক দেশ প্রকাশ্যে স্বীকার করে বিবৃতি দিতে না পারলেও তারা এটা জোরের সঙ্গে বলে, তারা কেউ নির্বাচিত নেতাকে গ্রেফতারের পক্ষে নয়। সেদিন এ কথাও সবাই বলেন, একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই তাঁর দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ নয়। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পরে বাস্তবে গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিক্রিয়া কী ছিল তা অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরের বিবৃতিই স্পষ্ট বলে দেয়। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন: 'The Austrian Chancellor, Dr. Bruno Kreisky, has deplored the detention of Sheikh Mujibur Rahman by the West Pakistan millitary junta and said that "no democratic party in Europe will tolerate it." (The Times OF INDIA, New Delhi- October 29, 1971). (অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ব্রুনো ক্রিসকি পাকিস্তানের সামরিক জান্তা যে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে তার কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'ইউরোপের কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এটা সহ্য করবে না।) তাই মুক্তিযুদ্ধে যেমন বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল, মাইন, গ্রেনেড– সবখানে ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তেমনি আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রায় এককভাবে লড়াই করেন নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যে কোনো মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন দেশের মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে হয়, তেমনি তার সঙ্গে সহযোদ্ধা হিসেবে দাঁড়ায় পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ। গোটা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে সেদিন বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ানোর নায্যতা দিয়েছিলেন বন্দি স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই জনগণের কূটনীতিতে সেদিন ইয়াহিয়াকে পরাজিত করেছিলেন বন্দি বঙ্গবন্ধু। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করে, সশস্ত্র পথে হানাদার তাড়ানোর যুদ্ধে সেদিন বঙ্গবন্ধুর ডিপ্লোম্যাসির কাছে হেরে যায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। বিজয়ী হন বঙ্গবন্ধু, রূপান্তরিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে। পরিণত হন পৃথিবীর মানুষের মুক্তিকামী অন্যতম গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে।

পৃথিবীতে বাংলাদেশের এই নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে হানাদার বিতাড়নের মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার আগে ঠিক শতভাগ এই ধরনের আর কোনো মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়া আর যে বিপ্লবগুলো হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চরিত্রের শতভাগ বিপরীত। ওইসব বিপ্লবের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশের হানাদার মুক্তির যুদ্ধকে দেখা হয় বলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির বিষয়টি বিশ্লেষণে ভুল করেন অনেকে। অনেকেই ভুল করে বলেন, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তারা বুঝতে ভুল করেন মুক্তিদাতা গণতান্ত্রিক নেতা যেভাবে উপস্থিত থাকেন, তিনি সেভাবেই উপস্থিত ছিলেন। যারা বলেন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তারা তাদের নিজের মাপে বঙ্গবন্ধুকে দেখেন।

আর এই জেল থেকে বিশ্বের কী মাপের নেতা হিসেবে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বের হয়ে এসেছিলেন, তা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের ওই সময়ের সম্পাদকীয় থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্র: The West Australian এর সম্পাদকীয়'র কয়েকটি লাইন ছিল এমনই– Sheikh Mujibur Rahman's emotional wellcome to Dacca by million Bengalies marks the beginning of the long and formidable task of creating a new nation. Bangla Desh has been proclaimed; the Sheikh's dream of liberation from Pakistan has been realised. His challenge now is to make the dream work.....Sheikh Mujib is the only man with the political authority and populer support to unite his people into a new nation.

(ঢাকায় লাখো বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানকে আবেগঘন অভ্যর্থনার ভেতর দিয়ে প্রমাণ করে, নতুন একটি জাতি গঠনের কঠিন ও দীর্ঘযাত্রা শুরু হলো। বাংলাদেশ এখন আনুষ্ঠানিক, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার যে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন শেখের ছিল, সেটা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এখন তার দায় স্বপ্নকে প্রকৃত বাস্তবায়ন করা। ... শেখ মুজিবই একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তি যার ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে তিনি তাঁর জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করে জাতিতে পরিণত করতে পারবেন)।

এই সম্পাদকীয়র এ কটা লাইন প্রমাণ করে, পাকিস্তানের কারাগারে যাকে রাখা হয়েছিল, তিনি বাংলাদেশের সরকারপ্রধান, তাঁরই স্বপ্ন এই বাংলাদেশ। তিনি এ জাতির মূল অথরিটি। এটা পাকিস্তানের বাইরের একটি জাতিগোষ্ঠী।

এটা যেমন জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার মুহূর্তের বাস্তবতা নিয়ে লেখা একটি সম্পাদকীয়, তেমনি দেশে ফেরার আগে ৩ জানুয়ারি ১৯৭২ The New York Times লেখে:

"Sheikh Mujibur Rahman, the charismatic East Bengali leader who was seized by the discredited Government of president Yahya Khan last March 25 at the beginning of the crackdown that led to East Pakistan's final secession. Bangladesh urgently needs Sheikh Mujib's leadership to unify its people for urgent tasks of rehabilitation, reconstruction and nation building. India needs Mujib even more desperately forestall a growing threat of anarchy and extremeism in this new border state and to promote conditions that will facilitate the speedy return of refugees of Bangladesh and the withdrawal of Indian troops."

(পূর্ব বাংলার অনন্য সাধারণ সহজাত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গত ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের মুহূর্তে পাকিস্তানের নিন্দিত ইয়াহিয়া সরকার গ্রেফতার করে, আর যার ভেতর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বেরিয়ে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। এখন বাংলাদেশের পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও জাতি গঠনের জন্য জরুরি দরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব। এমনকি ভারতের জন্য এখন আরো বেশি দরকার শেখ মুজিবকে। কারণ তার সীমান্তবর্তী এই নতুন রাষ্ট্র নৈরাজ্য বা সংঘাতের দিকে যেন না যায়। এজন্য ভারতের এখন দরকার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় শরণার্থীদের ফেরত পাঠানো এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার)।

নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয়র এ লাইনগুলোই প্রমাণ করে পাকিস্তানের জেলে বসে বঙ্গবন্ধু কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একক নেতৃত্বে ছিলেন। এমনকি যে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা ছিল, তাদের কাছেও তার অপরিহার্যতা কতখানি। আমরা নিউইয়র্ক টাইমসের সব শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে একমত হব না, তবে উপলব্ধি করব বঙ্গবন্ধুকে। আর নিশ্চয়ই আমরা ভবিষ্যতে কখনোই একমত হব না তাদের সঙ্গে, যারা বলেন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। বরং সত্যকে কঠিন পাথরে বিচার করে বুকে ধারণ করব– কী বিশালভাবে ও সঠিক পথে তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁর জেলে যাওয়ার আগে ও জেলে বসে উপস্থিতিকে তিনি কূটনৈতিক পথে কতটা সফল করেছিলেন।

(প্রবন্ধটি পিআইবিতে অনুষ্ঠিত শোকাবহ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম শীর্ষক আলোচনা সভায় পঠিত)

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

আমার স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু

সেলিনা খালেক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কবে প্রথম দেখেছি, সঠিক দিন-তারিখ বলতে পারব না। কিন্তু প্রথম দেখাতেই যে খুব ভালো লেগেছিল, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। গোপালগঞ্জের তৎকালীন এসডিপিও আবদুল খালেকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ১৯৫৩ সালে ২ অক্টোবর, ঢাকায়। আমি তখন ঢাকায় ইডেন কলেজে আইএ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। আমার বাবা সে সময়ে রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি পুলিশ এ কে এম হাফিজউদ্দিন। বিয়ের কয়েকদিন পরই খালেক সাহেব কাজে যোগদান করেন। আমি সঙ্গে যাইনি। একবারে আইএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫৪ সালে গোপালগঞ্জে যাই। তখন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন নিয়ে সবাই ব্যস্ত। গোপালগঞ্জে একদিকে শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যদিকে ওহিদুজ্জামান। দুজনই আমার বাবার আত্মীয়। শেখ মুজিবুর রহমানের চাচা শেখ মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী আব্বার চাচাতো বোন। সেই সূত্রে আব্বাকে শেখ সাহেব মামা সম্বোধন করতেন। আর ওহিদুজ্জামান সাহেবের ছোট ভাই ফয়কুজ্জামানের স্ত্রী ছিলেন আব্বার খালাতো ভাইয়ের মেয়ে। দুই পক্ষেরই খালেক সাহেব জামাই ছিলেন। নির্বাচনে দুই পক্ষ দুই দলে। কিন্তু খালেক সাহেব নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা দিয়ে নির্বাচনের সময় কাজ করেছেন। কেউ কোনো কথা বলতে

পারেনি। তারাও কখনো তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেননি। বঙ্গবন্ধু মাঝেমধ্যে আমাদের বাসায় আসতেন। ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই খালেক সাহেবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় ছিল। একদিন হঠাৎ দুপুরের দিকে বঙ্গবন্ধু এলেন। সেদিন ছিল শবেবরাত। সেসময় একটা প্রথা চালু ছিল যে, শবেবরাতে ভালো খাওয়া-দাওয়া করলে, নতুন কাপড় পরলে, দান-খয়রাত করলে সারাটা বছর ভালো থাকা যাবে। সেসময় আমরা আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী, মসজিদ ও গরিব-দুঃখীদের মধ্যে হালুয়া-রুটি বিতরণ করাকে ছোয়াবের কাজ বলে মনে করতাম। দুপুরে পোলাও রান্না করা হয়েছিল। তাঁকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। তিনি উল্টো আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুই কি রান্না করতে পারিস? আপনারা অনেকে হয়তো জানেন তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট এবং যাদের স্নেহ করতেন, তাদের 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি আমাদের দুজনকেই তুই বলতেন। আমার এখনো মনে আছে, তিনি আমার বাসায় সেদিন খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন। তাঁকে আর কখনো খাওয়ানোর সুযোগ আমার হয়নি।

১৯৭৪/৭৫-এ ১৭ মার্চে তাঁর জন্মদিনে আমার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমরা দু'জন গিয়েছিলাম। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রশিদ তালুকদারকে বললেন, আমাদের সঙ্গে ছবি তুলতে। ছবি তুলতে একটু দেরি হচ্ছিল। ঠাট্টা করে বললেন, রশিদ ফিল্ম আছে তো, নাকি এমনি টিপাটিপি করছো? এমনই ছিল তাঁর উপস্থিত রসিকতা করার ক্ষমতা। স্বাধীনতার পর একটি অনুষ্ঠানে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমরা সবাই জানি অসাধারণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। কবে, কোথায়, কার বাড়িতে কী দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন, তা তিনি মনে করে বলতে পারতেন। ওদের গ্রামের বাড়িতে কবে অনেক রকম মাছ দিয়ে আমার বড়ো ভাসুর খাইয়েছিলেন তা তাঁর মনে আছে। কে কার আত্মীয়, সেটাও তিনি মনে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম, খালেক সাহেব অফিসের কাজে আপনার বাসায় গেলে ভাবি সবসময় খাইয়ে দেন। আমার যে সৌভাগ্য হয় না। হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন, তুই গেলে তোর ভাবি তোকেও খাওয়াবে।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সারদা পুলিশ একাডেমিতে গিয়েছিলেন। খালেক সাহেব আইজি পুলিশ। সেখানে স্মৃতিস্তম্ভে তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ফিরে এসে আমাকে বলছিলেন, আমি জানি তোরা অনেক কষ্ট করেছিস '৭১-এ। আমি বলেছিলাম, আল্লাহর অসীম কৃপায় আমরা বেঁচে আছি, যদিও সারদায় আমাদের সবকিছু লুটপাট হয়ে গেছে। আজ হয়তো এই স্মৃতিস্তম্ভে আপনি আমাদের জন্যও দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলতেন। জবাবে বললেন, তুই অনেক বেশি কথা বলিস। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখতাম। সবসময় কথা বলার সুযোগ হতো না। শেষবার দেখেছিলাম হাস্যোজ্জ্বল নেতাকে শেখ কামালের বিয়েতে। খালেক সাহেব টাই-স্যুট পরে গিয়েছিলেন। উনি টাইটা ধরে বললেন, ইস, একবারে টাই-স্যুট পরে এসেছে। খালেক সাহেব জবাব দিলেন, রাষ্ট্রপতির ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে টাই-স্যুট না পরলে কেমন দেখাবে?

১৯৭৫ সালে নানা পত্রপত্রিকায় নানাজনের কথা, নানা ভবিষ্যদ্বাণী ও নানারকম গুজব বের হলে খালেক সাহেবের হাতে যা আসত, তা তিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখাতেন। এক জায়গায় লেখা হয় "Mujib's funie will bleed". উনি হেসে প্রশ্ন করেছিলেন, Funie বলতে কী বোঝায়? খালেক সাহেব উত্তরে বলেছিলেন, এর অর্থ খেলার পোশাক বা জামা। বঙ্গবন্ধু হেসে বলেছিলেন, আমি এসব বিশ্বাস করি না। কথাগুলো ১৫ই আগস্ট সত্য প্রমাণিত হলো। প্রিয় নেতার পোশাক রক্তাক্ত হলো।

আমরা তখন ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরীতে থাকি। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে খালেক সাহেব রমনা থানায় ফোন করলেন। ধানমণ্ডির শব্দ বোধহয় আমরা শুনিনি। রমনায় সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায় গোলাগুলির শব্দ। পরে রেডিও'তে মেজর ডালিমের দম্ভভরা গলায় মর্মান্তিক খবরটা শুনলাম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। আমরা সবাই ভীষণভাবে মর্মাহত। খালেক সাহেব বেশ কয়েকদিন অফিসে যাননি। আমরা দু'জনই তাঁকে ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরও গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা করে– "যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই।"

লেখক: *সাবেক আইজিপি আবদুল খালেকের সহধর্মিণী*

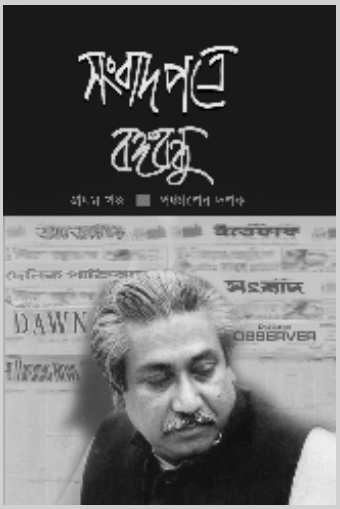

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

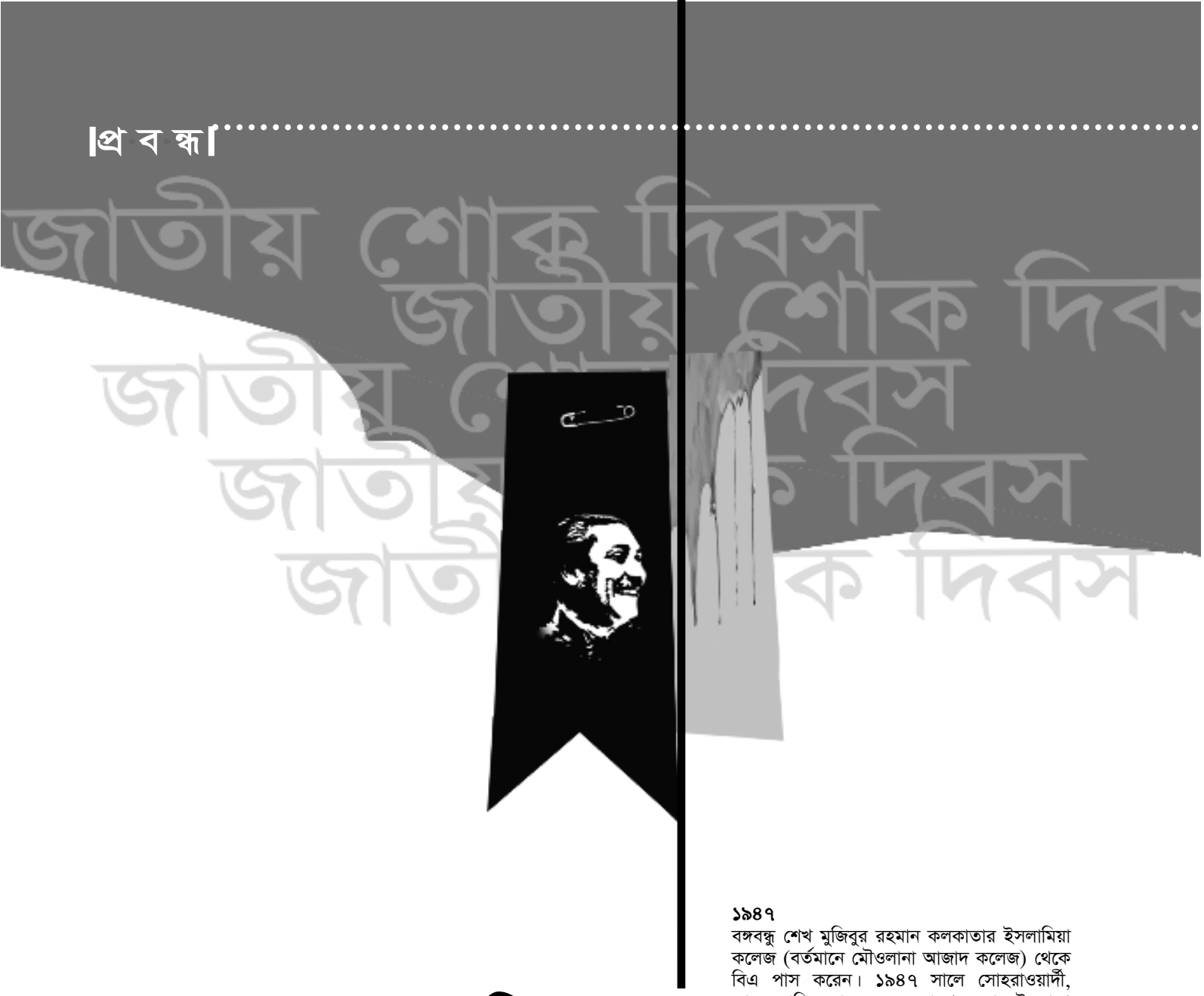

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: তথ্য সংকলন

ড. আবুল কাশেম

১৯৪৭

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌওলানা আজাদ কলেজ) থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতার উদ্যোগে অবিভক্ত, অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হলে শেখ মুজিব তাতে সমর্থন জানান। জুনে বাংলা ও ভারত বিভক্তি চূড়ান্ত করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হলে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের এক সভায় তিনি অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই বাংলা বেশিদিন পাকিস্তানের অঙ্গীভূত থাকবে না বলে মন্তব্য করেন।

১৯৪৮

৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ঘরানার রাজনৈতিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এই ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রলীগের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটির সংযুক্তি সমসাময়িক সময়ে এবং পরবর্তীকালে বহু সমালোচনার জন্ম দেয়। বঙ্গবন্ধু নীতি ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে বাস্তব পরিস্থিতিতে কৌশল হিসেবে মুসলিম ছাত্রলীগ নামকরণের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। এতে তাঁর নেতৃত্বসুলভ প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ছাত্রজনতা রাস্তায় নামে। ওই দিন পুরো প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। শেখ মুজিব সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এটাই পাকিস্তানের ইতিহাসে শেখ মুজিবের প্রথম গ্রেফতারবরণ। ১৫ মার্চ মুক্তিলাভ করে তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ৮ দফা চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সংশোধনী আনেন। ১৬ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের অবরোধে নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব।

১৯৪৯

মার্চ-এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয় ছাত্রলীগ। এ কারণে ছাত্রলীগের বহু নেতাকর্মীকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। শেখ মুজিবসহ (দ্বিতীয় বর্ষ, এলএলবি রোল নং-১৬৬, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) পাঁচজনকে পনেরো টাকা জরিমানা করা হয় এবং ১৭ এপ্রিলের মধ্যে সদাচরণের গ্যারান্টি দিতে বলা হয়। বঙ্গবন্ধু জরিমানা ও গ্যারান্টি দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসায় অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেওয়ায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।

২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মুজিব তখন কারাগারে। একটি ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দান করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। অন্তরিন থাকা অবস্থায়ই তিনি নবগঠিত এই প্রথম বিরোধী দলের প্রথম যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় যুগ্ম সম্পাদক হলেন খোন্দকার মোশতাক। খোন্দকার মোশতাক আবদার তুলেন, 'মুজিব যেহেতু কারাগারে, তাই প্রথম যুগ্ম সম্পাদক পদটি তার নিজেরই পাওয়া উচিত। সভাপতি মওলানা ভাসানী সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। এখান থেকেই মোশতাক শেখ মুজিবকে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে শুরু করে। জুনের শেষদিকে তিনি মুক্তি পান। সেপ্টেম্বরে খাদ্য সংকটবিরোধী আন্দোলনের সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে শেখ মুজিবকে আটক করা হয় এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। অক্টোবরে খাদ্য সংকটের কারণে তাঁকে এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫০

আটচল্লিশের ১১ মার্চ হলো প্রথম ভাষাসংগ্রাম দিবস। এই দিনকে প্রতিবছর পালন করা হতো। ১৯৫০ সালে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে এ দিবসটি পালনের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রাক্কালে শেখ মুজিবকে জানুয়ারিতে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পূর্ব বাংলা সফরের প্রতিবাদে দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

১৯৫২

২৭ জানুয়ারি ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভাষার দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ৩১ জানুয়ারি এক সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও ছাত্রলীগের সহসভাপতি কাজী গোলাম মাহাবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সভায় একটি প্রস্তাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। অপর একটি প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আটক বন্দিদের মুক্তি দাবি করা হয়। এ সময় তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। তিনি সেখানে আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫৩

ইতোমধ্যে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রথম সম্মেলনে তিনি সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। ২০-পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করে এই রিপোর্টে মুজিব বলেন, 'মানুষ সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া রক্ত স্বাক্ষরে শপথ লিখিয়াছে, জীবনের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা না পাইলে তাদের আন্দোলন থামিবে না। ১৯৪৯ সালের স্বাধীনতা লুপ্তির আশঙ্কা, সরকারে প্রতি মোহ, পাক-ভারত তিক্ত সম্পর্ক, হিন্দু-মুসলমানে একটা সন্দেহের ভাব ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার অভাব এবং সাংগঠনিক শূন্যতার পরিবেশ আজ চিরবিদায় নিয়েছে। আজ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারবিরোধী। স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে চায় জীবন ও জীবিকার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে। জীবন-জীবিকার লড়াইয়ে প্রত্যেক মানুষ বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে দুশমনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে চায়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধকে তারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ বলিয়া মনে করেন না।' এই রিপোর্টে শেখ মুজিব আরো বলেন, 'আওয়ামী লীগ ঘোষণা করিয়াছে কমনওয়েলথ-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। তারা আরও দেখিয়াছে কৃষ্টি ও শিল্পে তারা যে প্রগতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে উহা সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একান্ত পরিপন্থী। তাই আওয়ামী লীগ কমনওয়েলথ ত্যাগই নহে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী জোটের সাথে সম্পর্কহীন সক্রিয় নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিয়াছে।' এতে বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে শেখ মুজিবের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৫৪

মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ দক্ষিণ মুসলিম কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ১৯ হাজার ৩৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের অহিদুজ্জামান পান ৯ হাজার ৫৬৯ ভোট (আজাদ, ২২ মার্চ, ১৯৫৪)। যুক্তফ্রন্টের ব্যাপক বিজয় লাভ ঘটে। ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি আসন। ফলে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে। শেখ মুজিব শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, কৃষিঋণ, বনজসম্পদ ও সমবায়মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকচক্র বাঙালির এই রাজনৈতিক বিজয়কে নস্যাৎ করতে দ্বিধা করেনি। পূর্ব বাংলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-কে ধারা জারি করে কেন্দ্রের শাসন চালু করা হয়। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। পূর্ব বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন কুখ্যাত জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। তিনি ক্ষমতা নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রী শেখ মুজিবকে কারারুদ্ধ করেন। ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান।

শেখ মুজিব শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, কৃষিঋণ, বনজসম্পদ ও সমবায়মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকচক্র বাঙালির এই রাজনৈতিক বিজয়কে নস্যাৎ করতে দ্বিধা করেনি। পূর্ব বাংলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-কে ধারা জারি করে কেন্দ্রের শাসন চালু করা হয়

মে মাসে Pakistan-US Mutual Aid and Security Assistance Agreement বা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদ এবং ছাত্ররা সোচ্চার হয়ে উঠেন। মুজিবসহ দেড় শতাধিক যুক্তফ্রন্ট দলীয় সদস্য এর বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেন।

১৯৫৫

জুনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের

দাবি, অধিকার ও স্বার্থের জন্য অনবরত সোচ্চার হতে থাকেন। প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধানে 'পূর্ব বাংলা'র নাম পাল্টিয়ে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হলে তিনি এর বিরোধিতা করেন এবং নতুন নামকরণের আগে জনগণের মতামত নেওয়ার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন: "Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make Bengal. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.'

অক্টোবরে আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এই সম্মেলনে সংগঠনকে একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য তুলে ধরা হলো: 'যে সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি 'সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের ধর্মানুরাগের সুযোগে ইসলামকে হাতিয়ার করেই তার শাসন অব্যাহত রেখেছিল। জনগণও তখন লীগ সরকারের বিভ্রান্তি হতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এই অবস্থায় আমাদের সংগনকে অসাম্প্রদায়িক করা সম্ভব হলেও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের মোকাবিলা করার কাজে তা ব্যর্থ হতো। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। .... আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা গোষণা করতে পারি যে, দেশের সব ধর্মের, সব বর্ণের এবং সব ভাষাভাষী মানুষকে একটি গণপ্রতিষ্ঠানে সমবেত করা প্রয়োজন। বস্তুত আওয়ামী লীগ দলকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য অবারিত করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হব।

১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সবক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে গণপরিষদে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,

> 'My friends have told just now why this inferiority complex? Sometimes we ponder, why this inferiority complex on both sides? For seven years East Pakistan was in a majority and there was that inferiority complex "that we are in a minority and let us live together as brothers and Pakistan. For this reason accept parity.'
>
> East Pakistan has a population of 56 percent and West Pakistan has only 44 percent population. With a view to establishing good relations and to ensure co-operation and to remove any misunderstanding created in both the wings by the ruling clique for Pakistan will feel confident and they will shake off their inferiority complex and they will be our brothers and they will do justice to the people of East Pakistan. I have referred to this before several times....
>
> Why in the matter of Services we should have parity? People of East Bengal claim parity today; we claim representation according to population, in the matter of Services. They will not accept it, it was a promise of the leaders of West Pakistan that parity not only in representation but, in all respects, Services, etc. shall be ensured. Now you are going back on promises, which you made at Muree and Karachi. We the people of East Pakistan and we the representatives of East Pakistan claim parity in all matters. We should be guided in all things on population basis. Not only in there matters of representation, there should be parity in the services-Defense-everything, we will have parity. We will fight to the last.'

১৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। এতে শেখ মুজিব বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম এবং দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়। মুজিব রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সব সময় আমলাতন্ত্রের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার কথা বলেন। একজন গবেষক বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

> 'Ataur Rahman khan, as the chief Minister leading the administration, strongly believed in the traditional concept of an apolitical bureaucracy functioning independently of any political pressure to implement the declared policies of the government without having to be accountable to the functionaries of the ruling party. on the other hand, Shiekh Mujibur Rahman as the party Secretary, aspiring to buld a strong cadre based party organization and being very much aware of the near hostile attitude of the bureaucracy towards his party's plans and programs, insisted on the constant vigil by pray workers on the administrators at different levels and areas of administration.' (Shymati Gosh, The Awami League, P-29).

১৯৫৭

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে 'এক নেতা এক পদ' নীতি গৃহীত হলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ৩০ মে নির্দ্বিধায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন এবং দলের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই বছরের ৭ আগস্ট তিনি সমাজতান্ত্রিক চীন ও সোভিয়েত সফরে যান।

১৯৫৮

৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। বৎসরাধিককাল কারান্তরালে কাটানোর পর তিনি ১৯৫৯ সালের সিসেম্বরে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু জেল গেটে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬১

১৯৬১ সালে শেখ মুজিব হাইকোর্টের রিট আবেদনে জয়লাভ করে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। সামরিক শাসনের জাঁতাকলে মানুষ নিষ্পেষিত হতে হতে বছরের শেষ নাগাদ জনরোষ ধূমায়িত হতে শুরু করে। এ অবস্থায় আন্দোলন শুরুর প্রক্রিয়া নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গোপন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মণি সিংহ ও খোকা রায়। আলোচনায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরুর কথা বলেন। কমরেড খোকা রায় তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে তথ্য তুলে ধরেছেন, তা নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> 'আন্দোলনের দাবি নিয়ে আলোচনার সময় শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছিলেন যে, পাঞ্জাবের বিগ বিজনেস যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছিল এবং দাবিয়ে রাখছিল, তাতে

ওদের সাথে আমাদের থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, আন্দোলনের প্রোগ্রামে ওই দাবি রাখতে হবে ইত্যাদি। তখন আমরা (আমি ও মণি দা) শেখ মুজিবকে বুঝিয়েছিলাম যে, কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে; কিন্তু সে দাবি নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পরিস্থিতি তখনো ছিল না। 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি নিয়ে ওইসব আলোচনার পরের বৈঠকে শেখ মুজিব আমাদের জানিয়েছিলেন, 'ভাই, এবার আপনাদের কথা মেনে নিলাম। আমাদের নেতাও (অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী) আপনাদের বক্তব্য সমর্থন করেন। তাই এখনকার মতো সেটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের কথাটা থাকল।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬১ সন থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন।' (সংগ্রামের তিন দশক, ১৯৮৬, পৃ.১৮২-১৮৩)।

১৯৬২

৩০ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হলে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ জুন তিনি ছাড়া পান। জুনে আইয়ুব খান নিজ চিন্তা-চেতনাপ্রসূত সংবিধান জারি করেন। এ সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে বিখ্যাত 'নয় নেতার বিবৃতি' প্রকাশিত হয়। এ ৯ নেতার অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিব। এ বিবৃতিতে জনগণের সংবিধান, পূর্ণ সংসদীয় ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য নিরসনের দাবি করা হয়।

১৯৬৩

ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় ভাইস চ্যান্সেলর মাহমুদ হোসেনকে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে শেখ মুজিব বিবৃতি দেন:

'বর্তমান শাসকচক্র শুধুমাত্র দেশের প্রশাসনিক ব্যাপারেই নয়, এমন কি শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে বিরূপ দমননীতি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের আশ্রয় লয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বাধ্যতামূলক পদত্যাগ তাহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ইহার ফলে প্রদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। ... এক্ষেত্রে এমন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যাহার পবিত্রতা নষ্ট করা উচিত নয় এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চা গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ যাহার প্রতি সর্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে সে ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের কি উচিত নয় তাহার অধস্তনদের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও দমননীতির ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা? জনসাধারণ এ কথা নিশ্চয়ই বিচার করিতে পারে যে, আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র কিভাবে ছাত্রদের বিয়ষটি লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। সাম্প্রতিক কালে দেশের সর্বত্র একের পর এক অব্যাহত গতিতে ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করা ইহার আরেকটি প্রমাণ। এমতাবস্থায় রাজনীতিকরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ছাত্র সমাজকে কাজে লাগাইতেছে এই বলিয়া তাহাদের গলাবাজি কি মূর্খতাসূলভ দেখায় না?' (সংবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)।

১৯৬৪

বছরের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিব। কমিটির উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রচারপত্র পকাশ করা হয়। এই প্রচারপত্রের প্রকাশকের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে রাজনৈতিক দল বিধি জারি করেন। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সাহস না করে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী এনডিএফ'র সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর মুজিব আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এনডিএফ'র সঙ্গে যোগ না দিয়ে আওয়ামী লীগকে এককভাবে পুনরুজ্জীবিত করেন। এটি ছিল মুজিবের একটি অত্যন্ত বাস্তবানুগ ও সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়। এতে তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। যশোর মশিউর রহমান প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২৩ জনের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে এ প্রস্তাব পাস হয়। ছয় মাসের মধ্যে দলের কাউন্সিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। দলের মেনিফেস্টো প্রস্তুতকরণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন– অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমান, ড. আলীম আল রাজী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া আনোয়ার, আবদুর রহমান খান ও তাজউদ্দিন আহমদ। ৬ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সিলে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী কল্যাণমূলক সমাজ নির্মাণোপযোগী মেনিফেস্টো গ্রহণ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব এই কাউন্সিলে যে রিপোর্ট উপস্থাপন করেন, তার কিছু অংশ পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করা হলো:

'আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনাদের সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাসের সঙ্গে আপনাদের নতুন করে পরিচয় করানোর চেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। আপনারা জানেন, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা জানেন, সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ক রকম প্রতিকূল অবস্থা ও বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে আপনারা আওয়ামী লীগকে দেশের সেরা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের মূলনীতি যে দেশ থেকে যখন-তখন মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন মহলের ইঙ্গিতে নির্বাসন দেওয়া হয়, যে দেশের কথায় কথায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা ও কর্মীবৃন্দকে জেলে আটক করা হয়, সে দেশে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা একটা বিরাট কাজ, একটা কঠোর কাজ। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে জনকল্যাণকর ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত এর কোনোটাই সম্ভব হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের এতদিনের সংগ্রামে বিফল হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের সামনে মাত্র দু-একটি বিষয় অবতারণা করব। দেশ বিভাগের পর যখন দেশ একনায়কত্বের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, যখন তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করলে 'Opposition' 'কাজের কুচাল দেয়েঙ্গে' বলা হলো, তখন সর্বপ্রথম আমরা এদেশে বিরোধী দল সৃষ্টি করি। আমাদের প্রিয় নেতার সুষ্ঠু নেতৃত্ব আর সংগঠনি ক্ষমতার ফলে আপনাদের দ্বারা এদেশে আওয়ামী লীগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এদেশের আজ বহু রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণ সরকার ও সরকারি দলের সমালোচনা করেছেন এবং এ সমালোচনা করার যে তাদের অধিকার আছে, এটা একটা স্বীকৃত বিষয় হলেও এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করায় আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অবদান সবচেয়ে বেশি। এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, এ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কত সংগ্রাম, কত ত্যাগ আপনাদেরকে করতে হয়েছে, আপনাদের দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনার সে করুণ কাহিনী লেখা থাকবে পাকিস্তানের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করছি। আওয়ামী লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যার নেতা ও কর্মীবৃন্দ সর্বপ্রথমে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ও তার বাইরে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ও এখানকার দরিদ্র কৃষকের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রাকে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থে পশ্চিমাঞ্চলে ব্যয় হয়ে আসছে এবং বৈদেশিক ঋণ ও কেন্দ্র কর্তৃক অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় যে প্রায় সবই পশ্চিমাঞ্চলে করে আসছে, যার ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাট বৈষম্য ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এ কথাও দেশবাসীকে সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ শুনিয়েছিল। এইসব কথা বলার জন্য আপনারা কত জেল-জুলুম ও অত্যাচার ভোগ করেছেন। কিন্তু আজ এসব অন্যায়ের প্রতিকার এমন জোরালো গণদাবিতে পরিণত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সামরিক সরকার ও বর্তমান শাসক কর্তৃপক্ষও আজ বাধ্য হয়ে অন্তত কাজ না হলেও

মুখে আমাদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকা করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য এই বৈষম্যের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো দোষ নেই। এর পেছনে রয়েছে মুষ্টিমেয় সংশ্লিষ্ট স্বার্থপর মহল। এ বৈষম্য দূরীকরণের দাবির স্বীকৃতিই আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সংগ্রামের সফলতার স্বীকৃতির সাক্ষ্য।'

মার্চে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন শেখ মুজিব। সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সর্বজনীন ভোটাধিকার দিবস পালিত হয়।

আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৬৪ সালে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠিত হয়। এতে বামপন্থী ন্যাপ, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ, ডানপন্থী মুসলিম লীগ এবং ধর্মীয় মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামী অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফাতেমা জিন্নাহ ছিলেন বিরোধী দলীয় প্রার্থী। এ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৬৪ সালের ৭ নভেম্বর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। উল্লেখ্য যে, সম্মিলিত বিরোধী দলের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান থেকে বিরত রাখার জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টের আদেশে তিনি মুক্তি পান।

১৯৬৬

ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ছয় দফা প্রস্তাবের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের একটি অংশ এই প্রস্তাব আলোচনায় আনতে অস্বীকার করলে শেখ মুজিব সম্মেলনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৬ দফা গ্রহণ করে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একটি পুস্তিকা আকারে ছয় দফা প্রকাশের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এই সাব-কমিটির সদস্যরা হলেন– শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুস সালাম খান, জহিরুদ্দীন, তাজউদ্দিন আহমদ, হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং এ কে মজিবুর রহমান। সংক্ষেপে ছয় দফা নিম্নরূপ:

১. সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভার নির্বাচন এবং কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার। ২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্র দফতর; অন্যান্য দফতর প্রদেশের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ৩. দুই প্রদেশের জন্য পৃথক অথচ সহজ বিনিময় যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা দুই প্রদেশের জন্য অভিন্ন মুদ্রা থাকবে; সে ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচার রহিতকরণের সাংবিধানিক বিধান থাকবে। ৪. রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করবে প্রদেশগুলো। ৫. দুই প্রদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আলাদা হিসাব থাকবে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থ উভয় প্রদেশ আনুপাতিক হারে যোগান দিবে, দেশীয় পণ্যের উপর উভয় প্রদেশে কোনো কর ধার্য করা যাবে না, প্রদেশগুলো সাংবিধানিক বিধান মোতাবেক বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবে। ৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি বাহিনী থাকবে।

১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৪৪৩ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে শেখ মুজিব দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তাজউদ্দিন আহমদ। ২০ মার্চ ঢাকায় আইয়ুব খানের মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হয়। এতে আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেন। তিনি বলেন,

> ... the nation should be prepared to face even a civil war if thrusted upon her by the disruptionists to preserve the integrity and solidarity of the country... the results of the civil war were always berrible but we have to accept the challenge it forced upon us by those trying to wreck national unity ... if necessary we would use the language of weapon.' (পাকিস্তান অবজারভার, ২১ মার্চ ১৯৬৬)।

১৮ মার্চে দলীয় কাউন্সিলে অনুমোদিত হওয়ার পর শেখ মুজিব সমগ্র প্রদেশে ছয় দফা ব্যাখ্যার জন্য প্রচারাভিযানে বের হন। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি ২০ মার্চ ঢাকায়, ২৬ মার্চ সন্দ্বীপে, ২৭ মে চট্টগ্রামে, ৭ এপ্রিল যশোরে এবং ১৭ এপ্রিল খুলনায় ছয় দফা ব্যাখ্যা করে জনসভায় ভাষণ দেন। খুলনা থেকে ঢাকা ফেরার পথে তাঁকে যশোরে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনের ৪৭(৫) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। যশোরে সদর মহকুমা কোর্টে তিনি জামিন লাভ করেন। ১৪ মার্চ সিলেটের রেজিস্ট্রি পেনাল কোডের ১৫৩(ক), পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) এবং পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনের ৭৪(১) ধারায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এই অভিযোগে ঢাকায় ২১ এপ্রিল মুজিব গ্রেফতার হন এবং পুলিশ প্রহরায় তাঁকে সিলেট নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে যশোরের মহকুমা কোর্টের নির্দেশে ঢাকার মহকুমা কোর্টে হাজির হলে শেখ মুজিবের জামিন বাতিল করা হয়। পরে ঢাকার সেশন জজ কোর্ট থেকে তিনি জামিন লাভ করেছিলেন। যা হোক, ২২ এপ্রিল সিলেটের মহকুমা হাকিম এম ও গনি তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন। ফলে সেশন জজ কোর্টে জামিনের আবেদন করা হলে কোর্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার আগেই কোর্ট পরবর্তী ট্রেনে মুজিবকে ময়মনসিংহ পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দেয়। উল্লেখ্য, ময়মনসিংহে মুজিবের বিরুদ্ধে আরেকটি কেস ছিল। সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই মুজিবকে বহনকারী ট্রেন সিলেট ছেড়ে আসে।

আওয়ামী লীগের ওপর কি রূপ নির্যাতন চালানো হয়, তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। ... আমেনা বেগমের স্বামী মোশাররফ হোসেন স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন

২৪ এপ্রিল ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা ছিল। শেখ মুজিবের জন্য সভাপতির চেয়ার শূন্য রেখেই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহের মহকুমা কোর্ট জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন। ২৫ এপ্রিল ময়মনসিংহের দায়রা জজ শেখ মুজিবকে জামিন দেন। তিনি সড়কপথে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং এক জনসভায় ছয় দফাকে 'ম্যাগনাকার্টা' বলে অভিহিত করেন। তিনি ২৯ এপ্রিল কুমিল্লা, ৬ মে সিলেট এবং ৮ মে নারায়ণগঞ্জে জনসভায় ভাষণ দেন। ৮ মে রাত ২টায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দলের সাধারণ সম্পাদকও একই দিন গ্রেফতার হন। ৭ জুন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের বিপক্ষে সরকার প্রচণ্ড দমননীতি গ্রহণ করে। সরকারি প্রেস নোট মোতেবেক শুধু ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে দশ জন নিহত হন। হরতালের খবর প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আওয়ামী লীগের ওপর কি রূপ নির্যাতন চালানো হয়, তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশকে গ্রেফতার করা হলে একপর্যায়ে আমেনা বেগমকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়। আমেনা বেগমের স্বামী মোশাররফ হোসেন স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে সরকারবিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখতে পারছেন না– এই অভিযোগে তাকে সাসপেন্ড করা হয়।

১৯৬৮

জানুয়ারিতে সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার মারাত্মক এক ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে। এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে সরকার ঘোষণা করে। এটাই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র। অচিরেই সরকার মামলা শুরু করে এবং এই মামলার নাম হয় 'সরকার বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।' শেখ মুজিব স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। এ মামলা সরকারের জন্য Counter productive হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি জনগণের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে এ মামলার অবদান অপরিসীম।

১৯৬৯

৫ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১১ দফা ঘোষিত হয়। এ ঐতিহাসিক ১১ দফায় ১৭টি উপদফায় ছিল শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র স্বার্থ সংক্রান্ত দাবি। বাকি সবগুলোই সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত দাবি। ১১নং দফায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব মামলা প্রত্যাহারের দাবি করা হয়।

একই সময় ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) নামে রাজনৈতিক দলগুলোর একটি জোট গঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময় ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। শেখ মুজিব মুক্ত হন। মুজিবের মুক্তিকে ছাত্ররা প্রাথমিক বিজয় বলে বর্ণনা করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মুজিবকে অথ্যর্থনা দেওয়া হয়। এ অভ্যর্থনা সভায় সব গ্রুপের নেতাই মুজিবকে অভ্যর্থনা দেন। এ অভ্যর্থনা সভায় সব গ্রুপের নেতাই মুজিবকে ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বস্তুত আন্দোলন এমন একপর্যায়ে উপনীত হয় যে, আধা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ছাত্রদের পক্ষে আর আন্দোলনে কার্যকরী নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তারা মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে এবং তাঁকে সুশৃঙ্খল নির্দেশনা দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করে। ফলে তোফায়েল আহমেদসহ সব ছাত্রনেতাই বলেন, জনগণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে জনগণ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। মুজিব প্রত্যুত্তরে ১১ দফা বাস্তবায়নের দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার ওপর সরকারি নিপীড়ন-নির্যাতনের তিনি নিন্দা করেন। তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা দাবি করেন। সরকারি রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত না বাজানোর সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ ছাত্র জনসভাতেই শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং উপস্থিত এক মিলিয়ন হর্ষোৎফুল্ল মানুষ তুমুল করতালির মাধ্যমে তা সমর্থন করেন।

বঙ্গবন্ধু ২৭ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১০ মার্চের গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার সপক্ষে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সংসদীয় পদ্ধতির ফেডারেল সরকার ছাড়া ৬ দফা ও ১১ দফার আর কোনো দাবি মানা হয়নি। ফলে বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করেন। ন্যাপের মোজাফফর আহমদ ছাড়া 'ডাক'ভুক্ত আর কোনো নেতা তাঁকে সমর্থন করেননি। ফলে তিনি 'ডাক'-এর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অনুকূলে পদত্যাগ করলে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক আইন জারি হয়। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, বাঙালির আবাসভূমিকে বাংলাদেশ নামে অভিহিত করা হবে আর পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা নয়।

১৯৭০

৭ই মার্চ রেসকোর্স মাঠের জনসভায় প্রথম জয় বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করেন। ৪ জুন আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হন এ এইচ এম কামারুজ্জামান। এখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ইত্যাদি বিলুপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু রেডিও-টেলিভিশনে প্রাক-নির্বাচনী ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি রাজনৈতিক অধিকারহীনতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন।

৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ উপলক্ষ্যে জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুজিব বলেন, 'আওয়ামী লীগের বিরাট বিজয় প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের লাখ লাখ নিপীড়িত মানুষের বিজয়।' তিনি লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে অঙ্গীকার করেন। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি লাভ করে।

১৯৭১

৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার শপথ করান বঙ্গবন্ধু। ৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করেন। ভুট্টো এই সভা বয়কট করবেন বলে ঘোষণা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু তার তীব্র সমালোচনা করেন। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের সভা স্থগিত করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর ডাকে ৩ মার্চ হরতাল পালিত হয়। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ঘোষণা করেন। ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, সামরিক ব্যক্তিত্ব তথা স্বাধীনতাকামী আপামর বাঙালি জনতার কাছে এ ভাষণ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সবুজ সংকেতস্বরূপ। স্বাধীনতার ঘোষক বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্যতম প্রধান লে. জেনারেল মীর শওকত আলীকে একজন সাংবাদিক 'স্বাধীনতার ঘোষক কে'– এ প্রশ্ন করলে তিনি যে উত্তর দেন তা এরকম:

> 'আপনার বিবেককেই জিজ্ঞাসা করেন। এটা অনস্বীকার্য যে ২৫ এবং ২৬ শে মার্চ, '৭১-এর চরম মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালির মনেই স্বাধীনতার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বাঙালি সেদিন হয়ে ছিল স্বাধীনতার একেকজন ঘোষক। কিন্তু কে সেই মহান নেতা, যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙালিকে জুগিয়েছিলেন এই সাহস? কার আহ্বানে বাঙালি সেদিন পেয়েছিল স্বাধীনতার প্রেরণা। ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক শুনিয়েছিলেন? ২৬ শে মার্চ সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বললেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন, কে তাঁদের সেদিনের প্রেরণার উৎস ছিলেন? কার পক্ষে তাঁরা প্রচার করেছিলেন সেসব ঘোষণা, স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন, সেটা কি শুধু আনুষ্ঠানিকতা ছিল না? এই আনুষ্ঠানিকতার বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।' (শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন (ঢাকা: ১৯৮৪, পৃ. ১৬৬-১৬৭)।

১৬ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হয়। ২৫শে মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হলে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। আর দিয়ে যান সর্বাত্মক ক্র্যাকডাউনের নির্দেশ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে শুরু করে ইতিহাসের এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। ২৫শে মার্চ রাতে শুরু করে ইতিহাসের এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতের পরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি বলেন, 'This may meb may last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the armuy of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours.'

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এই ঘোষণা ওয়্যারলেস মারফত প্রচারিত হয়। পরে চট্টগ্রাম বেতার থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে ঘোষণা পাঠ করেন। ২৫শে মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন বঙ্গবন্ধু। তাঁর অবর্তমানেই তাঁর নেতৃত্বে ৯ মাসের মরণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।*

> কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না– তাঁর প্রত্যাশাকে আমরা বাস্তবায়িত করেছি। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।'
>
> –জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
>
> ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আবেগাপ্লুত ভাষণ থেকে

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ই আগস্ট লন্ডনের ন্যক্কারজনক তাণ্ডব

এক প্রেস কাউন্সিলরের ভাষ্য

মিনহাজ উদ্দীন

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির সমার্থক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে দেশ-বিদেশে এ দেশটি অন্যতম বড়ো পরিচয় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। যুদ্ধবিদ্ধস্ত, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির শিকার এ দেশটিকে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে শেখ মুজিবুর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কীভাবে দেশের ভালো হয়, কীভাবে দেশের আপামরসাধারণের জীবনমান উন্নত করা যায়, তা নিয়ে তিনি ছুটে গেছেন দেশ-দেশান্তরে। জাতির জনকের এ প্রচেষ্টার বিপরীতে ষড়যন্ত্রকারীরাও ছিল সক্রিয়। দলের ভেতরে মোশতাক গং যেমন সক্রিয় ছিল, ঠিক তেমনি চীনপন্থি বাম রাজনীতিকদের প্রচেষ্টাও ছিল ভয়ানক। এছাড়া অন্য কিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠনও শেখ মুজিবুর রহমানের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে ষড়যন্ত্র করে আসছিল। যাদের ঘৃণ্য চরিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর। তাদের বর্বর উল্লাস আর অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসনে জাতির পিতার সম্মানহানির চেষ্টা চলেছে সর্বাত্মক। জাতির পিতার হত্যা, শিশুপুত্র রাসেলের করুণ মৃত্যু তাদের কাঁদায়নি। বরং বর্বর উল্লাস আর বিজয়ের হাসিতে তারা বরণ করেছিল ১৫ই আগস্টকে। ইতিহাসের এই কালদিনটিতে লন্ডনে মোশতাক গং ও চীনপন্থি অতি বাম রাজনৈতিক

কর্মীদের বুনো উল্লাস দেখেছিলেন এম আর আখতার মুকুল (জন্ম: ৯ আগস্ট ১৯২৯, মৃত্যু: ২৬ জুন, ২০০৪)। ১৯৭১ সালের যুদ্ধদিনের ভূমিকার জন্য যিনি চরমপত্র নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৭৫ সালে এম আর আখতার মুকুল লন্ডনে প্রেস মিনিস্টারের দায়িত্বে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনাই এ দায়িত্ব দিয়ে তাকে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন। ১৫ই আগস্ট জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর খুনিদের সমর্থনে হৃদয়বিদারক এক তাণ্ডব দেখেছিলেন লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে, যা তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন 'মুজিবের রক্ত লাল' (সাগর পাবলিশার্স, ২০০০) বইটিতে। বইটির ১৫৮ থেকে ১৬৪নং পৃষ্ঠায় বিশেষ বর্ণনায় তিনি তুলে ধরেছেন ১৫ই আগস্ট তাণ্ডবের চিত্র।

লন্ডনে এম আর আখতার মুকুল জাতির পিতার সপরিবারে শহিদ হওয়ার সংবাদ পান কূটনীতিক কায়সার রশীদের কাছ থেকে। তিনিই প্রথম মুকুলকে এ খবর জানান। তারপর তারা শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের খবরটি নিশ্চিত হতে কয়েকটি ফোন করেন। আটলান্টিকের অপর প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রদূত সৈয়দ নূরুদ্দীনের কাছে তারা নিশ্চিত হন ভয়ংকর সেই ঘটনা সম্পর্কে। নূরুদ্দীন জানান, 'মুকুল কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ঢাকার খবর খুব খারাপ। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। ভয়েস অব আমেরিকায় একটু পর খবর শুনতে পাবে'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারকে নিয়ে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এম আর আখতার মুকুল। তিনি উল্লেখ করেছেন, হত্যাকাণ্ডের খবরের পর তাদের গন্তব্য ছিল লন্ডনের কুইন্স গেট এলাকায় বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস। কারণ তাদের ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কিছু একটা করবে চীনপন্থি ও জাসদ সমর্থকরা। তাদের লক্ষ্য হবে হাইকমিশনে কিছু একটা করে এমন বার্তা দেওয়া, যাতে সবাই বুঝতে পারে শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালিরা এখন আর সমর্থন করে না। ঘটনাটি ঘটেছিলও তাই। হাইকমিশন অফিসের সামনে গিয়েই এম আর আখতার মুকুল দেখতে পান অসংখ্য পুলিশ বাংলাদেশের হাইকমিশন অফিস ঘিরে রেখেছে। এরপর অফিসে ঢুকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন ভয়ানক এক চিত্র। সবকিছু তছনছ। এম আর আখতার মুকুলের ভাষায়, 'দেয়ালে টানানো নিহত প্রেসিডেন্ট মুজিবের ফটো সবকিছু ভেঙে একাকার হয়ে রয়েছে। একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখলাম। মিশনের নিরাপত্তা প্রহরীর কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত শুনলাম। সকাল ৮টা নাগাদ (লন্ডন সময়) একশ' জনের এক উত্তেজিত জনতা (প্রবাসী সিলেটি বাঙালি অনুপস্থিত) বাংলাদেশ হাইকমিশন আটক করায় এই লঙ্কাকাণ্ড। উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে হাইকমিশনার কর্তৃক আহ্বান না করা অবধি বিধিমতো মিশন ভবনে পুলিশের প্রবেশাধিকার নেই বলেই এই অবস্থা। এজন্যই আক্রমণকারীরা মিশনের ভেতরে ঢোকার পর ইচ্ছামতো ভাংচুর করতে সক্ষম হয়েছে।' (পৃষ্ঠা: ১৬১, মুজিবের রক্ত লাল)। এম আর আখতার মুকুলের এ ভাষ্যটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর লন্ডনে তাঁর নিয়োগ করা হাইকমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতানের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল অপ্রত্যাশিত, নতজানু প্রতিক্রিয়া। যাতে হতবাক হন প্রেস মিনিস্টার মুকুল। এছাড়া ডেপুটি হাইকমিশনার ফারুক চৌধুরীর একটি বক্তব্যে ব্যথিত হন তিনি। ওই দিন সকালের ব্রিটিশ গণমাধ্যমে ডেপুটি হাইকমিশনার ফারুক চৌধুরীর একটি বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছিল। যাতে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য ছিল। এদিকে ফারুক চৌধুরীর বক্তব্য প্রচারের পর বেশ বিরক্ত হন হাইকমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতান। এরপর তিনি নিজে গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হাইকমিশনের খুব কাছে কূলে থাকা সাংবাদিকদের ডেকে এনে তিনি যা বললেন, তার ভাবার্থ হল– 'অপশাসন থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে।'

এরপর দুপুরনাগাদ বাংলাদেশ হাইকমিশন চত্বরে সংঘটিত হয় আরেক ন্যক্কারজনক ঘটনা। সকালের যে শতাধিক প্রতিবাদকারী আক্রমণ করেছিল, তাদের ৫-৬ জন নেতা আবার হাইকমিশনে আসে অদ্ভুত এক দাবি নিয়ে। তাদের দাবি ছিল– সকালে যখন হাইকমিশনে ভাংচুর করা হয়, তখন বিবিসি ও আইটিভির ক্যামেরাপারসন ছবি তুলেতে পারেনি। তাই তাদের আবার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতিবাদকারীরা আবার হাইকমিশন ভাংচুর করবে এবং সেই ছবি ধারণ করবে ক্যামেরাপারসনরা। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর ভাংচুরকারীরা নতুন করে অনুমতি পেয়ে যায়! এম আর আখতার মুকুল বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'সে এক চরম লজ্জাকর আর অকল্পনীয় ব্যাপার। নিহত প্রেসিডেন্টের ফ্রেমওয়ালা ভাঙা আর ভালো অনেক ক'টা বড়ো ফটো এনে ডেপুটি হাইকমিশনারের বিরাট কামরার চারটি দেওয়ালে টাঙ্গানো হলো। টিভি ক্যামেরাম্যান আর প্রেস ফটোগ্রাফাররা ঘরের এক কোণে 'পজিশন' নেওয়ার পর আকস্মিকভাবে শুরু হল এক পৈশাচিক ব্যাপার। মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের ফটো ভাঙা এবং পা দিয়ে সবার সামনে দলিত-মথিত করল।' (পৃষ্ঠা: ১৬২)। কী ভয়ানক ঘটনা। আর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের পেশাদারিত্বের কী দারুণ নমুনা! যা এখন বিস্ময় জাগায় সংবাদকর্মীদের মনে।

এখানেই শেষ নয়। ওই দিন লন্ডন হাইকমিশনে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যা ছিল অকল্পনীয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ কীভাবে এতটা পরিবর্তিত হয়, তা ওঠে আসে সে সব ঘটনায়। দ্বিতীয় দফায় ছবি ভাঙার পর ভাংচুরকারীরা হাইকমিশনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এন এম মিহিরকে অপসারণের দাবি জানায়। বিনা বাক্যে মিশনপ্রধান সেই দাবি মেনে নেন। আর মিশন ভবন থেকে বের হয়ে যান মিহির। প্রশ্ন উঠে– কীভাবে বঙ্গবন্ধুর এত কাছের মানুষ হাইকমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতান দ্রুত বদলে গেলেন। কীভাবে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অসম্মানে ওই অপশক্তির সব দাবি মেনে নিলেন। হয়তো শেখ মুজিবুর রহমানই মানুষ চিনতে পারেননি। রাজনীতিতে কোণঠাসা সুলতান সাহেবকে লন্ডনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় দায়িত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। হয়তো এটাই ছিল তাঁর অপরাধ বা বড়ো ভুল। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কিছুদিন পরই ঢাকায় বদলি করা হয় এম আর আখতার মুকুলকে। মুকুল সেই আদেশ অমান্য করে লন্ডনেই থেকে যান। পার করেন অনেক কঠিন সময়। এম আর আখতার মুকুল ওই বইয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ১৯৭৩ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, সরকারের পতনের ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এক আলোচনার শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে (মুকুলকে) বলেছিলেন, 'আমাকে মারতে চাস, মার। তোরা কোনো দিন শান্তি পাবি না।' সত্যিই তাই, জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর হত্যাকারীরা শান্তি পায়নি। এমনকি যারা বর্বর ওই হত্যাকাণ্ডের পর পৈশাচিক আনন্দে মেতেছিল, তাদের মনেও শান্তি বা স্থিতিশীলতা আসেনি, যা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে প্রমাণিত হয়েছে বারবার।

> দলের ভেতরে মোশতাক গং যেমন সক্রিয় ছিল, ঠিক তেমনি চীনপন্থি বাম রাজনীতিকদের প্রচেষ্টাও ছিল ভয়ানক। এছাড়া অন্য কিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠনও শেখ মুজিবুর রহমানের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে ষড়যন্ত্র করে আসছিল। যাদের ঘৃণ্য চরিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর। তাদের বর্বর উল্লাস আর অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসনে জাতির পিতার সম্মানহানির চেষ্টা চলেছে সর্বাত্মক। জাতির পিতার হত্যা, শিশুপুত্র রাসেলের করুণ মৃত্যু তাদের কাঁদায়নি

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাঙালির অবিনাশী আলোকবর্তিকা

ড. মাহাবুবুর রহমান

‘একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে’– কথাটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। বলেছিলেন তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে। বাঙালি জাতির স্রষ্টা এই মহামানব বাঙালির নিরন্তর প্রেরণার উৎস। আলোকবর্তিকা হয়ে বাঙালি জাতির হাজার বছরের এই শ্রেষ্ঠ সন্তান আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। বিশ্বের দরবারে লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঙালি জাতি যে আজ স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে, তা বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের আত্মত্যাগ আর দূরদর্শী, বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফল। বাংলাদেশ যে আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নত শির নিয়ে দাঁড়িয়ে, বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে বাঙালির যে ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা, তার শেকড় প্রোথিত সোনার বাঙলা বির্নিমাণে বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু স্বপ্নে। বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ আর পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা পাই। যে পথনির্দেশনাই বর্তমান

বাংলাদেশের উন্নয়নের কৌশলপত্র। এ কথার সত্যাসত্য খুঁজে পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার কণ্ঠেও। তিনি বলেন, 'আমি যখনই, যেখানে উন্নয়নের জন্য হাত দিই, সেখানেই দেখি আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া আর দিকনির্দেশনা।'[১]

বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত, ইতিহাসের এই মহানায়ক তাঁর সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এদেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে। তাঁর সমগ্র জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি। আর তাই নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবার প্রতি ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে বঙ্গবন্ধু পরম মমতায় বাঙালি জাতিকে আপন করে নিয়েছেন, মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন দেশের মানুষকে। অপরিসীম ভালোবাসায় তাই বঙ্গবন্ধুর সরল স্বীকারোক্তি, আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমি বাংলার আকাশকে ভালোবাসি। আমি বাংলার বাতাসকে ভালোবাসি। আমি বাংলার নদ-নদীকে ভালোবাসি। আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে।[২] বাঙালি জাতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর এই শর্তহীন নিস্বার্থ ভালোবাসার প্রবহমানতা আমরা লক্ষ করি তাঁর সুযোগ্য কন্যা বিশ্ব মানবতার নেত্রী শেখ হাসিনার উচ্চারণেও। বাঙালি ও বাংলাদেশের উন্নয়নে পিতার মতোই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী ও আত্মত্যাগকারী শেখ হাসিনার দৃঢ় উচ্চারণ, 'আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাই আমার রাজনীতি। বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য প্রয়োজন হলে এই সংগ্রামে পিতার মতো আমিও জীবনদান করতে প্রস্তুত।' তাই আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালে, শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পর্যালোচনা করলে আমরা প্রকটভাবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকেই পরিলক্ষিত করি।

বাঙালির আত্মার আত্মীয় এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ স্বাধীনতার পরপরই এ দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে যে আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, বাবারা একটু লেখাপড়া শিখ। যতই জিন্দাবাদ করো, মুর্দাবাদ করো ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখলে কোনো লাভ নাই। আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু থাকে বাপ-মাকে সাহায্য করো। প্যান্ট পরা শিখে বাবার সাথে হাল ধরতে লজ্জা করো না, কোদাল মারতে লজ্জা করো না। দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখো। কানাডায় দেখলাম ছাত্ররা ছুটির সময় লিফট চালায়। ছুটির সময় দু'প-য়সা উপার্জন করতে চায়। আর আমাদের ছেলেরা বড় আরামে খান আর তাস নিয়ে ফটাফট খেলতে বসেন। গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুনগাছ লাগিও, কয়টা মরিচগাছ লাগিও। কয়টা লাউগাছ ও কয়টা নারকেলের চারা লাগিও। বাপ-মাকে একটু সাহায্য করো। কয়টা মুরগি পাল। কয়টা হাঁস পাল। জাতীয় সম্পদ বাড়বে। তোমার খরচ তুমি বহন করতে পারবে। বাবার কাছ থেকে যদি এতটুকু জমি নিয়ে দশটা লাউ গাছ, ৫০টা মরিচগাছ, কয়টা নারিকেল গাছ লাগানো যায়, দেখবে ২-৩শ' টাকা আয় হয়ে গেছে। তোমরা ঐ টাকা দিয়েই বই কিনতে পারবে। কাজ করো, কঠোর পরিশ্রম করো। নইলে বাঁচতে পারবে না। শুধু বিএ, এমএ পাস করে লাভ নেই। আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুল। যাতে সত্যিকার মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানি পয়দা করেই একবার ইংরেজ শেষ করে গেছে দেশটা। তোমাদের মানুষ হতে হবে ভাইয়েরা।[৩]

বঙ্গবন্ধুর সেই দিকনির্দেশনার প্রতিধ্বনি আমরা প্রায় ৪৮ বছর পর আবারও খেয়াল করি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্যে। ছাত্রলীগের ৭০তম সম্মেলনে শেখ হাসিনা উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমাদেরকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা থেকে বিদ্যা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ উন্নতি সাধন করতে পারে না এবং একটি জাতি কখনো কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে না। জ্ঞানের আলোকে পাথেয় করে শান্তি এবং অগ্রগতির পথে তোমাদের অগ্রসর হতে হবে। তোমরা যখন গ্রামে যাবে, সেখানকার অশিক্ষিত শিশু-কিশোরদের পড়ালেখা করতে উৎসাহিত করবে। ছাত্রলীগের জন্মদিনে তোমাদের প্রতি আমার এই অনুরোধ রইল।[৪]

এমনি করে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শন বাঙালি ও বাংলাদেশকে পথ দেখিয়ে চলেছে অবিরত। শান্তিতে-সংগ্রামে, শোকে-শক্তিতে বঙ্গবন্ধু আলোকবর্তিকা নিয়ে আমাদের পথ দেখান। বাঙালি জাতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর এই অপরিসীম ভালোবাসা ও ত্যাগকে অমর্ত্য সেন তুলে ধরেছেন এভাবে, বর্তমান যুগের ইতিহাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জন্ম একটি বিরাট ঘটনা। সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব, শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রমাণ সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির বন্ধু ও অধিনায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সভ্যতা, সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, সব মানুষের মানবাধিকারের স্বীকৃতি। তাঁর সাবলীল চিন্তাধারার সঠিক মূল্য শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত পৃথিবীও স্বীকার করবে, এ আশা আমাদের আছে এবং থাকবে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে শেখ মুজিবের বিশাল মহিমার একটি প্রকাশ যেমন আমরা দেখতে পাই, তাঁর মহামানবতার আরেকটা পরিচয় আমরা পাই তাঁর চিন্তাধারার অসাধারণতায়।[৫]

স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে কাঁধে তুলে নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাতদিন পরিশ্রম করেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য চষে বেড়ান দেশের পর দেশ এবং সফলও হন প্রায় শতভাগ। বঙ্গবন্ধুর আপসহীন আর উদার রাজনৈতিক দর্শন অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ববাসীর নজর কেড়ে নেয়। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়চিত্তে বাঙালির শৌর্য-বীর্যের মহিমা তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীন কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন, 'স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙালি শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার যোগ্য ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত রহিয়াছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহিদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবে। জাতিসংঘের সনদে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে, তা অর্জনের জন্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার লাখো লাখো মুক্তিসেনানীকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এই সংগ্রাম এখনো চলছে। গায়ের জোরে বেআইনিভাবে এলাকা দখল, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে নস্যাৎ করার কাজে শক্তির ব্যবহার ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে চলছে এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ব্যর্থ হয়নি। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও গিনি বিসাউ-এ বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। এ জয় দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ইতিহাস জনগণের পক্ষে ও ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত। ... বাংলাদেশের মতো যেইসব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদের এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে। মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি।'[৬]

বঙ্গবন্ধুর এই দৃপ্তকণ্ঠের উচ্চারণ পরবর্তী সময়ে প্রতিফলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশটিকে মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি একটি পরিশীলিত অবস্থানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর ক্যারিশমেটিক নেতৃত্বের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর বছরদুয়েকের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ভৈরব ব্রিজসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত করেন। স্থল ও রেলপথের পাশাপাশি নদীবন্দরগুলোকেও সচল করার উদ্যোগ নেন। অল্প সময়ের মধ্যে ৭টি ফেরি ও ৬০৫টি নৌযান চালু করা হয় যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজীকরণের স্বার্থে। শুধু তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৮৫১টি রেল ওয়াগন ও যাত্রীবাহী বগি, ৪০৬টি বাস এবং ৩টি পুরোনো বিমানবন্দর চালু হয়। এভাবে সারা দেশে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক চারু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান জরুরি ভিত্তিতে জাতীয়করণ ও উৎপাদনক্ষম করে লাখো শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন সব ব্যাংককে জাতীয়করণ করে ৬টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত থেকে ফেরা এক কোটিরও বেশি শরণার্থীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন এবং একই সঙ্গে কোটি কোটি ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্যের সংস্থান করে মানুষের ক্ষুধার সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষ যেন ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতে পারে, এজন্য বঙ্গবন্ধু ইউনিয়ন, থানা ও মহোকুমা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য কনজিউমার স্টোর চালু করেন।[৭]

বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরের মধ্যেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন মাথায় রেখে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্যদূরীকরণ ও বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পুনর্গঠন কাজ অব্যাহত রেখে কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির প্রধান খাতগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা, বার্ষিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশ অর্জন করা, ৪১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা, জনসাধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও প্রাপ্তি স্বল্পমূল্যে নিশ্চিত করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশে নামিয়ে আনাসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে

বঙ্গবন্ধু সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করেন এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানি হায়েনাদের ১১ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস পুষিয়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন স্তম্ভ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮]

দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর খুনি মোশতাক-চক্র বঙ্গবন্ধুকে বাঁচতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে বিদীর্ণ হওয়ার আগেই তিনি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির পথনির্দেশনা তৈরি করে গেছেন। আজ তাঁরই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনকে পাথেয় করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ বছরই বাংলাদেশ বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়ে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে প্রবেশ করেছে এবং নেতৃত্বের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। মুক্তির এ মিছিলে বঙ্গবন্ধু আলোর মশাল জ্বেলে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ, মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ সাড়ে তিন বছরেই তিনি বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষার দর্শন সুস্পষ্ট করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রায় ৪৮ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বাংলাদেশকে পথ দেখাচ্ছে। আজকের বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কৌশল ও নীতিমালা এতটুকু ফিকে হয়ে যায়নি বরং উত্তরোত্তর গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে, নিবিড় বিশ্লেষণের গুরুত্ব দাবি করছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে বলা হয়, 'সমাজতান্ত্রিক দর্শনের নিরিখে জনসাধারণ যাতে শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ লাভ করতে পারে, তার জন্য একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে জাতীয় প্রয়োজনে দক্ষ জনশক্তি গঠনের ওপর জোর দেওয়া হবে এবং কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ করে জনশক্তিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা চালানো হবে।[৯]

স্বাধীনতার এত বছর পর আজ আমরা উপলব্ধি করি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া আমাদের শিক্ষিত, তরুণ জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলার বিকল্প কোনো পথ নেই। আর তাই বঙ্গবন্ধুকন্যার শিক্ষানীতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এমনি করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে শতভাগ প্রাসঙ্গিক এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় শেখ হাসিনার যে গৃহীত নীতি ও দর্শন, সেখানে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও দর্শনের প্রতিফলন শতভাগ।

বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের জয়গান বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের ফ্রেমে সবসময় স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন রাজনীতি করেছেন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছেন এদেশের দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। ১৯৭৩ সালের ৩ আগস্ট কানাডার অটোয়াতে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সূচনা বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'এই সময়ে আমাদের মূল সমস্যাগুলো হলো বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, মূলত দরিদ্র দেশগুলোর মানুষদের যারা 'উন্নয়নশীল বিশ্ব' গঠন করেছে। আমরা বেশ ভালো করেই জানি ৭.৫ কোটি মানুষের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, জরা এবং বেকারত্ব দূর করা যে কী দুরূহ কাজ। এ কাজটি আরও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে যখন এসব সমস্যার সমাধান আমাদের একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়, যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হয়। এসব উদ্বেগ ও সমস্যা আমাদের উন্নয়নশীল বিশ্বে আগে থেকেই ছিল এবং থেকেই যাবে। কিন্তু মনে হয়, এখন সময় এসেছে উন্নত বিশ্বের উচিত এসব উদ্বেগের অংশ নিজেদের মনে করে বহন করার। অল্প কয়েকটি উন্নত অঞ্চলের চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা সীমাহীন দুর্দশাগ্রস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের এই ভগ্নপ্রায় পৃথিবীর এই পীড়িত অবস্থাকে পরিবর্তন করাটা একটি সর্বজনীন স্বার্থের বিষয়, এটি তাদের স্বীকার করা উচিত।'[১০]

দারিদ্র্যকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেই বঙ্গবন্ধু ক্ষান্ত হননি বরং এ সমস্যা মোকাবিলার দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। ১৯৭২ সালে ১ মার্চ রাশিয়ার মস্কোয় বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ উচ্চারণ, 'এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ ও ভ্রাতৃত্বের পুনর্জাগরণ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতিই কেবল বর্তমান সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান ঘটাতে সক্ষম। বর্তমান দুর্যোগ কাটাতে হলে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। বর্তমানের এত বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা জাতিসংঘ অতীতে কখনো করেনি। এ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যুক্তির মুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা। এ ব্যবস্থায় থাকবে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রতিটি দেশের সার্বভৌম অধিকারের নিশ্চয়তা। এ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বাস্তুকাঠামো, যার ভিত্তি হবে স্থিতিশীল ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ স্বার্থের স্বীকৃতি। এখন এমন একটি সময় যখন আমাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে আমাদের একটি আন্তর্জাতিক দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব হলো বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যাতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মর্যাদার উপযোগী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণায় এ অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া আছে।'[১১]

আজকের পৃথিবীতেও বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য একই রকমভাবে প্রাসঙ্গিক। কোনো কোনো প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর এ বলিষ্ঠ উচ্চারণের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার দূরীকরণ, নিপীড়িত মানুষের ওপর বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর বল প্রয়োগসহ নানা ইস্যুর সমাধানে বঙ্গবন্ধুর এ অমীয় বাণী হতে পারে দিকনির্দেশক। বঙ্গবন্ধুর এই দৃপ্ত উচ্চারণ আর দেশমাতৃকার প্রতি গভীর অনুরাগকে শ্রদ্ধা করে কিউবান নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি; কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই ব্যক্তি হিমালয়ের সমান। সুতরাং আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।'

বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত এই মহান নেতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন বাঙালির মুক্তি আদায়ের লক্ষ্যে। শুধু স্বাধীনতার লাল সূর্য এনে দিয়েই বঙ্গবন্ধু থেমে যাননি। শোষণ-বঞ্চনামুক্ত একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর যে অবদান ও দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসীর জন্য সারা জীবন অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাওয়া বঙ্গবন্ধু অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মঞ্চ দখল করেছিলেন। আর তাই জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে, সংকটে-সম্ভাবনায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন আমাদের পথ দেখায়, মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। শেষ করছি ব্রিটিশ মানবতাবাদী নেতা লর্ড ফেনার ব্রুকওয়ের একটি বক্তব্য দিয়ে। তাঁর মতে, 'একদিক থেকে বিবেচনা করলে শেখ মুজিব ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী এবং ডি ভেলেরার চেয়ে মহান। কারণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা এতটাই প্রকট যে, তিনি দেশের সব সীমানা পেরিয়ে বাঙালির মুক্তির দূত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।"[১২] বঙ্গবন্ধু তাই বাঙালির অবিনাশী আলোকবর্তিকা, মুক্তির নিশান, আত্মার আত্মীয়, অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে চিরকাল আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় জাজ্বল্যমান থাকবেন, পথ দেখাবেন।

তথ্যসূত্র

১. গোলাম সাব্বির সাত্তার, 'বঙ্গবন্ধু: ত্রিকালদর্শী বাঙালী মহাপুরুষ', চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. মে ৯, ১৯৭২, রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

৩. এ এইচ.খান (২০১১), *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*, তৃতীয় খন্ড, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ঢাকা।

৪. *The Daily Star*, January 5, 2018

5. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ-২ (২০০৭), জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা।

৬. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ' বিশ্ব পরিমন্ডলে বঙ্গবন্ধু' চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. ড. মো. ইলিয়াছ হোসেন, " বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা: স্বপ্ন ও রুপায়ন", চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. প্রাগুক্ত

৯. ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম "বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন", চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ' বিশ্ব পরিমন্ডলে বঙ্গবন্ধু', চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ' বিশ্ব পরিমন্ডলে বঙ্গবন্ধু' চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. ড. প্রণব কুমার পান্ডে, ' ১৭ই মার্চ, ১৯২০: একটি ইতিহাসের জন্ম', চিত্ত রঞ্জন মিশ্র ও অন্যান্য সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জনক জোর্তিময়*, ২০১৮, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাবি

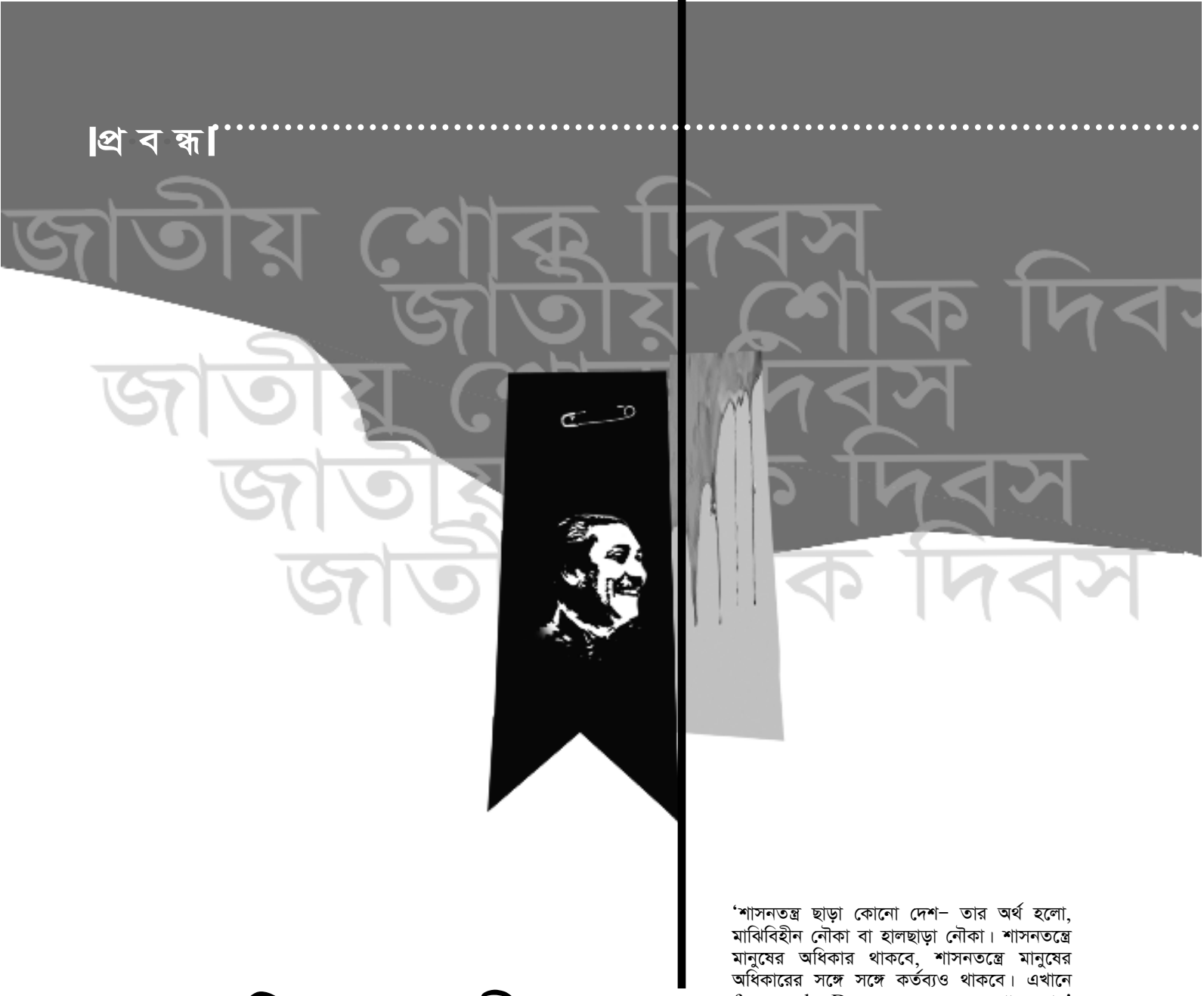

বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং রক্তে লেখা বঙ্গবন্ধুর সংবিধান

সুমি খান

‘শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ– তার অর্থ হলো, মাঝিবিহীন নৌকা বা হালছাড়া নৌকা। শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও থাকবে। এখানে free style Democracy চলতে পারে না।’ গণপরিষদ নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কথা বলেছিলেন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিলের ওপর আলোচনাকালে। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীরা কীভাবে বিশ্ব মানচিত্রে লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য একটি দূরদর্শী শাসনতন্ত্র রচনা করার সংগ্রাম সফল করেছিলেন, সেটাই এ নিবন্ধের আলোচ্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ৪৩ বছর পার হলো এ বছরের ১৫ই আগস্ট। নিষ্ঠুর এ হত্যাকাণ্ডের হোতারা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আর্দশ হত্যা করতে। কিন্তু ঘাতকচক্র ও তাদের পেছনে থাকা ষড়যন্ত্রকারী মহল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া দারুণভাবে বিঘ্নিত করতে সমর্থ হলেও পারেনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মুছে দিতে।

১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকার এক দুরভিসন্ধি নিয়ে বঙ্গভঙ্গ করে। এরপর পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা

সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় জীবনে অংশগ্রহণের সামান্য সুযোগ পায়। এখানে শিক্ষার প্রসারের সুযোগ ঘটে। ৬ বছর পর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাঙালির এই নবোন্মেষ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে শিক্ষা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকে বাঙালি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র (states) প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর আবারো দীর্ঘ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও গণবিস্ফোরণ ঘটে। আর সেই সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

সিআর দাস থেকে শুরু করে সুভাষ বসু পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রাথমিক বিকাশ এবং সেই বোধের পরিচর্যা ও লালনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রকৃত উন্মেষ ঘটে বলে মনে করেন ইতিহাসজ্ঞরা। যার ধারাবাহিকতায় এ ভূখণ্ডের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন এবং ১০ মাসের মধ্যে একটি দূরদর্শী শাসনতন্ত্র রচনার মতো বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র সম্পর্কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের বিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি দেশমাতৃকার সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে যারা যোগ দিয়েছিলেন এবং শহিদ হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে উলেখ করেছেন। তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবে বলেছেন, 'তাঁদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। জনাব স্পিকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভককে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।'

এ বক্তব্য দেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু বারবার উলেখ করেন, 'জনাব স্পিকার আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো জাতিকে একটি সংবিধান দেওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি হয়, সেই সংবিধান দেয়ার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের মাধ্যমে তাঁদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায় বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমার সহকর্মীদের আত্মীয়স্বজনদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সেই অধিকার পুরোপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নাই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগত, অনেক দেরি হয়ে যেত। এই অ্যাসেম্বলি ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বারের বসার জায়গা ছিল। আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই অ্যাসেম্বলি ভবন নাও থাকত, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন– এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই। আমরা কিছু দিতে পারছি না। মানুষ কষ্ট করছে। হাজার লোক বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন –আপনার কাছে আবার বলছি যে, আমার সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসব। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করব তা নয়। দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইব।'

প্রস্তাবনায় বঙ্গবন্ধু উলেখ করেন, এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, 'আমরা গত ২৩ বছরে কী দেখেছি– শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে মার্শাল ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলেই 'হিন্দুস্থানের দালাল'– এই ধরনের কথা সারা জীবন শুনে আসছি। সেসব যাতে এদেশ থেকে উঠে যায়, সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।'

অত্যন্ত দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রস্তাব পেশকালে পদে পদে একটি গণমুখী সংবিধান প্রণয়নের কথা বারবার উলেখ করেছেন। বক্তব্য শেষ করার আগে আবারো বলেছেন, 'জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পিকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটি গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।'

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিলের ওপর আলোচনায় গণপরিষদ নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, 'প্রায় ৭২ দিন আমাদের এই কমিটির সদস্যরা কাজ করেছেন, চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত সংবিধান যতদূর সম্ভব দেখাশোনা করে একটি খসড়া আজ এই গণপরিষদে পেশ করতে পেরেছেন।' এরপর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের নিষ্ঠুরতার ২০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, 'আমি জানি না আপনাদের memory short কিনা। বাংলার মানুষ ভুলে যায় কি না। এদের পাশবিক অত্যাচার– পশুর মতো, বর্বরের মতো, যাতে হিটলারও লজ্জা পায়, যাতে হালাকু খানও লজ্জা পায়, যাতে চেঙ্গিস খানও লজ্জা পায়। অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের মাটিতে। আজ বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যরা সেই রক্তলেখা দিয়ে শাসনতন্ত্র দিতে চান। শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না।'

এ সময়ে জাতির জনক উলেখ করেন, 'ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। শাসনতন্ত্র দিতে লাগলো ১৯৫০ সাল। ২৫ বছরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। তদানীন্তন গণপরিষদের সদস্যরা যেটা করেছিল, সেটা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য, বাংলার মানুষকে শোষণ করার জন্য। কিন্তু পারে নাই। জাগ্রত সমাজ রক্ত দিতে শিখেছে। যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না।'

বঙ্গবন্ধু অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তিনি বলে যান, 'স্পিকার সাহেব, জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ৮০ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন, গত মহাযুদ্ধে যখন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করে এবং জার্মানিকে পদানত করে, তখন জার্মানি যেরকম ধ্বংস হয়েছিল, সেই রকম সমপরিমাণে ধ্বংস হয়েছে বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের শেখের কথা নয়, এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কথা, যারা বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, জার্মানির লোক এক বছর, দেড় বছর শুধু রুটি খেয়ে ছিল। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, রাশিয়ার বিপ্লবের পরে একমাত্র লেনিনগ্রাদে ১২ লক্ষ লোক শীতে মারা গিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনার পর দেশের যা অবস্থা হয়, যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা তা জানেন না। যুগোস্লাভিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তারা জানেন না। ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর কী অবস্থা হয়েছিল, তা তারা জানেন না। বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তারা জানেন না। বাংলার অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। কারণ বাংলাদেশ যাদের হাতে ছিল, তারা মানুষ ছিল না, ছিল অমানুষ। তারা মানুষ নয়, মানুষের চেয়ে অধম, তারা পশু। তারা মানুষকে হত্যা করেছে। সিংহ, বাঘ যখন মানুষকে হত্যা করে, তখন এক আঘাতে হত্যা করে। কিন্তু পাকিস্তানি পশুর দল আমার একেক জন কর্মীকে ধরে নিয়ে মাসের পর মাস অত্যাচার করে হত্যা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ কর্মীকে তারা হত্যা করেছে। দু'লক্ষ মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর সৈন্যরা। আমাকে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। বাংলার মানুষকে কমপক্ষে খেয়ে বাঁচতে হবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে আপিল করেছিলাম। দুনিয়ার মানুষ এগিয়ে এসেছে। সাহায্য আমাদের দুনিয়ার মানুষ করেছে। বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রথম লড়াই শুরু করেছিলাম দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলেছিল, ৫০ লক্ষ লোক বাংলাদেশে না খেয়ে রাস্তায় মারা যাবে। কতটুকু করতে পেরেছি জানি না। শুধু এটুকু জানি, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। জানি, অবস্থা ভয়াবহ। বিরাট ভয়, আঘাত বড়, বিরাট আঘাত। ধ্বংস বড়, বিরাট ধ্বংস। একটা গাছের ফল হতে ৬ বছর সময় লাগে। ধ্বংসস্তূপ এই বিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কী লাগে, তা যারা গড়ে, তারাই বুঝে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। এ কথা যদি আমি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় হবে। যদি ৮ লক্ষ-৯ লক্ষ টন খাদ্য দিয়ে ভারত আমাদের সাহায্য না করত, যদি ভারত খাদ্যদ্রব্য না দিত, তাহলে কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল না এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা

করার। অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না। জনাব স্পিকার সাহেব, বাংলা আর কিছু হতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। আজ যে এক কোটি লোককে খাবার দেওয়া হলো, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।'

বিশ্বনেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উলেখ করেন, 'দুনিয়ার ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় না ১০ মাসের মধ্যে কোনো দেশ শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আমি নিশ্চয়ই, মোবারকবাদ জানাব শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্যদের। মোবারকবাদ জানাব বাংলার জনসাধারণকে। রক্তে লেখা এই শাসনতন্ত্র। যারা আজ অন্য কথা বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত যে, এ শাসনতন্ত্র আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের আগে থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা হতে হতে শাসনতন্ত্র কী হবে তার ওপরে ভোটের মাধ্যমে, শতকরা ৯৮ জন লোক তাদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে। দরকার হলে আওয়ামী লীগ আরেকবার ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করবে। খবরের কাগজ থাকলে বক্তৃতা লেখা যায়, ময়দান তাকলে বক্তৃতা দেওয়া যায়, কিন্তু জনসাধারণের কতটা সমর্থন আছে, তার পরীক্ষা হয় যখন জনগণ অধিকার পায় ভোট দেওয়ার। সেজন্য আজ ১০ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেশের সামনে পেশ করা যাচ্ছে। শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ– তার অর্থ হলো মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা। শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে, অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্তব্যও থাকবে। এখানে free style democracy চলতে পারে না। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে, কর্তব্যও থাকবে। এবং যতদূর সম্ভব, যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে, সেটা যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক, সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।'

বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ-বাঙালি জাতীয়তাবাদ– এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি।' বঙ্গবন্ধু সংবিধানের মূলনীতি নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণি আর কোনো দিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না এবং সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৫৪ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না। সেই জন্য অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক। আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা।'

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে ব্যাখ্যা দেন এভাবে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে; মুসলিম তার ধর্ম পালন করবে; খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুস্পষ্টভাবে উলেখ করেন, 'রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তবে বাংলার মানুষ তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ আমি বিশ্বাস করি।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুস্পষ্টভাবে আবারো উলেখ করেন, 'এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরি হবে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এইজন্য সংগ্রাম করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই জন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। সোনার মানুষ ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।'

এসব ইতিহাস অনেকেরই অজানা। এ কারণে বারবার ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে দেশে দুর্বৃত্তায়ন এবং দুঃশাসনের কালে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রকৃত তাৎপর্য, ওই ভাষণটি স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল কিনা, এ ভাষণ এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সাংবিধানিক অবস্থান কী ছিল– এসব প্রশ্ন তোলা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা ঘোষণার পরবর্তী এক দশকে এসব প্রশ্ন দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে অসদুদ্দেশ্যে এসব প্রশ্ন তোলা হয় বারবার।

এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পাকিস্তান সৃষ্টির অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় ৪০ বছর আগে থেকে ভারতের জনগণের দুটি রাজনৈতিক মুখপাত্র, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছিল। Government of India Act, ১৯৩৫-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কিছু স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এবং এই আইনের আওতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো আসলে ছিল ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই কংগ্রেস দেশজুড়ে 'ভারত ছাড় আন্দোলন'র সূচনা করে। ওদিকে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী একে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনে ভারতের অভ্যন্তরে একাধিক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের (states) দাবি উত্থাপন করেন। দাবিটি মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই পৃথক জাতির বাস তথা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। মূলত এ দ্বিজাতি তত্ত্বই ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবির একমাত্র যৌক্তিক ভিত্তি।

এই প্রস্তাব এবং পাকিস্তান পরিকল্পনায় ধারণা ছিল, পূর্বাঞ্চলে বাংলাসহ ভারতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয় এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার সে দাবি বিবেচনা করতে নীতিগতভাবে বাধ্য হয়। সমস্যা ছিল একটিই– অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা পাবে, নাকি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে সেগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাবে।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাদেশিক নির্বাচন শুরু হয় এবং মুসলিম লীগ ওই নির্বাচনটি পাকিস্তান দাবির প্রতি গণভোট হিসেবে গ্রহণ করে। অবিভক্ত ভারতে বাংলা ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একক মুসলিম-অধ্যুষিত প্রদেশ। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিমের নেতৃত্বে এক বিশাল কর্মীবাহিনী বাংলার গ্রামগঞ্জে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির সপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারণা চালাতে থাকে। বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রলীগ এবং সব স্তরের ছাত্রজনতা এই প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এতে বাংলার কৃষক জনগোষ্ঠীর মনে আশা জন্মে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে তারা হাজার বছরের বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাবে, রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের হয়ে কথা বলবে। ফলে মুসলিম লীগ অখণ্ড বাংলা প্রদেশে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১২১টি আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন লাভ করে তারা। সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিম লীগ আর কোথাও এমন বিপুল বিজয় পায়নি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশসহ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তারা। কেবল সিন্ধুপ্রদেশে তারা অতিসামান্য ভোটের ব্যবধানে কষ্টার্জিত জয় লাভ করে।

বাংলায় মুসলিম লীগের এরূপ ভূমিধস বিজয়ের ফলে জিন্নাহর পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিটি ব্রিটিশ রাজ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, উপমহাদেশে পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমানদেরই মুখ্য অবদান ছিল। নির্বাচনের পর সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ৩ এপ্রিল বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, ১৯৪৭-পূর্ববর্তী বছরগুলোয় কলকাতায় অধ্যয়নরত শেখ মুজিব রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর বিশ্বস্ত অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এ সময় ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিলিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সম্মেলনে জিন্নাহর পরামর্শে সোহরাওয়ার্দী একক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই সভায় বাংলার মুসলিম লীগের নেতারা ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম লীগের সব নেতাই একক পাকিস্তানের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। ফলে একক পাকিস্তানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। যদিও দিলি-সভার প্রস্তাব সর্বভারতীয় লাহোর প্রস্তাবের ওপর প্রাধান্য পাবে কি না, সে প্রশ্নও বাঙালি নেতাদের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত টেকানো সম্ভব হয়নি।

১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিম স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জিন্নাহ কিছুটা মৌনসম্মতি দিলেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭

সালের ১৮ জুলাই Indian Independence Act, 1947-এর মাধ্যমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন করার জন্য ইম্পিরিয়াল পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন হলেও ১১ আগস্ট গণপরিষদে প্রদত্ত প্রথম নীতিনির্ধারণী বক্তৃতায় জিন্নাহ পেছনের কথা ভুলে গিয়ে সবাইকে মিলেমিশে সমানভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ধর্মীয়ভাবে নয়, বরং রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্র পরিচলিত হবে। (Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims.)

এতে মনে হয়, নতুন রাষ্ট্রে তিনি হয়তো দ্বিজাতি তত্ত্বের পরিবর্তে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের গণপরিষদে অবাঙালি ও উর্দুভাষীদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বঞ্চনা শুরু হলো। গণপরিষদে বাঙালি সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। পরে ১৯৪৮ সালে মার্চে জিন্নাহ ঢাকার তদানীন্তন রেসকোর্স ও কার্জন হলে অনুষ্ঠিত দুটি পৃথক সভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে ঘোষণা দেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' স্বাধীনতা লাভের সাত মাসের মাথায় বাঙালির মননে চরম ধাক্কা লাগে, তাদের আশাভঙ্গের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে পূর্ববঙ্গ শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের একটি কলোনিতে পরিণত হয়। শুরু হয় তেইশ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং প্রদেশগুলোয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রথমে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে পাকিস্তানজুড়ে প্রচারণা চালান। জনগণের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং ছয় দফার গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় শাসকগোষ্ঠী তাঁর ওপর মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলাসহ কারা-নির্যাতন চাপিয়ে দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করে। তাতে দেশের জনগণের কাছে তিনি আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হন। জনগণ তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর সহযোদ্ধারাসহ তাঁকে কারামুক্ত করেন। তিনি ভূষিত হন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। এর পর থেকে বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ নেতৃত্বে গঠনমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সামরিক জান্তা আইয়ুব খান, যাকে এশিয়ার 'লৌহমানব' বলা হতো, তিনি পদত্যাগে বাধ্য হলেন। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন আরেক সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খানও Legal Framework Order (LFO) ১৯৭০ মারফত আওয়ামী লীগ কর্তৃক দাবিকৃত সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন।

এভাবে মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের একক আস্থাভাজন নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংগ্রামের এক মূর্তপ্রতীক হয়ে উঠেন। আওয়ামী লীগ হয়ে যায় পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল। জাঁদরেল সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের পর তাই শেখ মুজিবুর রহমানকে 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করতে বাধ্য হন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পূর্বপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নানা ক্ষোভ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও নিজেদের 'পাকিস্তানি' মনে করত। কারণ বাঙালিরাই তাদের ভোটের জোরে পাকিস্তান এনেছিল; কিন্তু ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় পাকিস্তানি শাসকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফন্দিতে তাদের একগুঁয়ে মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রত্যেক বাঙালির মনে তখন একটি প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয়, 'আর নয়, আর পাকিস্তান নয়, এবার দাবি এক দফা– বাংলার স্বাধীনতা।'

বাঙালির মনোজগতে এ স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ লক্ষ্যেই তিনি আকৈশোর নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন করে গিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ধারণা করা যায়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু ৬ দফার ওপর ভিত্তি করে আপাতত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পথপরিক্রমায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

১ মার্চ থেকে পুরো দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যেতে থাকে। সে প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে যদিও ১ মার্চ থেকে বাঙালিদের দাবি ৬ দফার পরিবর্তে ১ দফা তথা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়, নির্বাচিত নেতাদেরকে তাদের নির্বাচনের ম্যান্ডেট এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি মাথায় রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষ করে ওই সময় আফ্রিকার নাইজেরিয়ার একটি অংশে চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছিল না, বরং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা হিসেবেই গণ্য হচ্ছিল।

এমন জটিল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমস্যা মাথায় রেখেই বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যা শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা বোঝায় না, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে শাসকদের কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেয়।

বঙ্গবন্ধু সম্ভবত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বার্তাই দিতে চাচ্ছিলেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেও তাদের জন্মগত অধিকার। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক শক্তি প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক আইনবহির্ভূতভাবে তাদের নিষ্পেষণ করছে।

১৯৭১ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বার্তা দেন যে, এ অঞ্চলের স্বাধীনতার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করবে না। সে প্রেক্ষাপটেই হয়তো বঙ্গবন্ধু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসক যখন বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর নগ্ন হত্যালীলা শুরু করে, তখন সেই দায়ভার তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে সারা বিশ্ব বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। এ কৌশলই বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এ কারণে তাঁকে ২৬ই মার্চের প্রথম প্রহর পর্যন্ত অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র কিংবা এর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল বিদ্যমান ছিল। জাতিসংঘ সনদের আওতায় প্রত্যেক জাতি ও মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। ১ মার্চ পশ্চিমাঞ্চলে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন একটি সরকার কার্যকর থাকলেও পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ১ মার্চের পর থেকে এ অংশে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হতে থাকে। এর জন্য দায়ী পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের স্বৈরাচারী ভূমিকা।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০ আসন লাভ করে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর ১ মার্চ অপরাহ্নে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত বাঙালি সদস্য ও প্রাদেশিক সদস্যরা তাদের সবার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সব ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুকে অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুর ওপর এরূপ আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণের পক্ষে তাঁর বক্তব্য প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নৈতিক ও আইনগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোও বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিতেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে নীতিনির্ধারণী ও বাঙালির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। তাঁর নির্দেশনা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের সব সরকারি অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক সংস্থা, ব্যাংক-বীমাসহ সব ধরনের অফিস পরিচালিত হতে থাকে। এমনকি কাঁচাবাজারের মালিকরা সেনাবাহিনীকে খাদ্যসহ কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। দেশের প্রতিটি সাধারণ কর্মকাণ্ড বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে চলতে থাকে।

চট্টগ্রামের ডক শ্রমিকরা জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসে বিরত থাকে। দেশরক্ষা বিভাগে চাকরিরত বেসামরিক কর্মচারীরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে কেবল ক্যান্টনমেন্টগুলোয় পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীয়মান হলেও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।

সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে ১ থেকে ২৫ মার্চ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান পর্যালোচনা করে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জন্য তথাকথিত গণতন্ত্র সৃষ্টি করে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের মার্চে সেই সংবিধান বাতিল করে সামরিক আইন জারি করেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট সামরিক আইন ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসনকাল উভয়ই অবৈধ ঘোষণা করেন।

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। এলএফওর আইনগত অবস্থান যাই হোক না কেন, পাকিস্তানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি

নির্বাচন করায় দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের শুধু নৈতিক নয়, বরং আইনগত অধিকারও জন্ম নিয়েছিল, যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার দাবি রাখে।

সেই প্রেক্ষাপটেই বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা ও বাঙালি জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন।

এবার আন্তর্জাতিক আইনের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, দেশের জনগণ সাধারণভাবে দেশের মালিক। বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবেও সঠিক। তবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন 'সংশিষ্ট সময়ে কোন শক্তির হাতে রাষ্ট্রটির কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ (effective control) বিদ্যমান ছিল' তা নিরূপণ করা।

১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫ মার্চ নিঃসন্দেহে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশের দৈনন্দিন সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারপরও জনপ্রতিনিধিরা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রমের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন না।

পাকিস্তানি অত্যাচারী শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তার সামরিক কর্তৃত্ব সত্যিকার অর্থে অবৈধ হলেও তারাই পূর্ব পাকিস্তানের এই অঞ্চলসহ সমগ্র পাকিস্তানের কার্যকরী নিয়ন্ত্রক ছিল। যার প্রকাশ ঘটে ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে নির্বিচার গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, গণধর্ষণ, লুঠতরাজ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের পৈশাচিক বর্বরতার মাধ্যমে। যার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে বাঙালি জাতিসত্তার বোধন, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এরপর 'জয় বাংলা' স্লোগানে ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে বাঙালি জাতিসত্তা কার্যকারিতা লাভ করেছিল, তা সশস্ত্র সংগ্রামে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার পূর্ণতা লাভ হয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। বাঙালি জাতি বাংলাদেশের de facto i de jure মালিক হয়।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের দিনই তিনি Provisional Constitution Order জারি করে সর্বতোভাবে চরম বিধ্বস্ত দেশকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনেন। তারপর তাঁর নেতৃত্বে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতিকে একটি অতি উৎকৃষ্ট সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হন। বিশ্ব ইতিহাসে যার বিকল্প এখনো পরিলক্ষিত হয় না বলেই মনে করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞরা। এটি একটি বিশ্বরেকর্ডও বটে। বিশ্ব ইতিহাসে প্রমাণিত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোনো দেশ এত অল্প সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেনি। সাবেক বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক তাঁর এক লেখনীতে উলেখ করেন, তখন আমাদের কোনো মার্শাল প্ল্যান ছিল না। বঙ্গবন্ধু সীমিত সম্পদ দিয়েই আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের বিনির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই দেশটির প্রায় সর্বক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ানোর ছাপ স্পষ্টতর হতে থাকে।

এই সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত পটভূমিকায় রচিত। এর ৪টি মূলনীতির প্রধান ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানে এই মূলনীতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটেছে, যা মেনে নিতে পারেনি দ্বিজাতি তত্ত্বের অনুসারীরা। আর এ কারণেই জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা এবং জাতীয় চার নেতা হত্যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয় পাকিস্তানের পরাজিত শক্তির প্রতিভূ। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পবিত্র সংবিধানে কাটাছেঁড়া করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিচিত করে কলঙ্কিত করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রচিত পবিত্র রক্তলেখায় রচিত সংবিধানকে।

আর তখনই একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা এই দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। একের পর এক কালো অধ্যায় পেরিয়ে আমরা এখন বিশ্ব মানচিত্রে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় পরিণত একটি জাতি। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির ইতিহাসের মহান নেতা এবং বিশ্বনেতা হিসেবে গোটা বিশ্বে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে বারবার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনো সংবিধানের অন্যতম প্রধান মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি সরকার। যে কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ৩০ লাখ শহিদের প্রাপ্য সম্মান এখনো প্রতিষ্ঠা হয়নি বলেই মনে করেন দেশের সংখ্যালঘু জনগণ। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু দ্বিজাতি তত্ত্বের টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছেন মনে করলেও তা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে সামরিক উর্দির লেবাসে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কাটাছেঁড়া করেছে পবিত্র সংবিধানকে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অঙ্গীকারেরও অপমৃত্যু ঘটে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর একাত্তরের ঘাতক ধর্ম ব্যবসায়ীদের এদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের অপরাজনীতি করার বৈধতা দিয়ে আবারো অন্ধকারের শক্তিকে ৩০ লাখ শহিদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত মাটিতে দাপিয়ে বেড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জনগণ। তাদের বিশ্বাস, ধর্মনিরপেক্ষতা যেদিন সংবিধানে পুনঃস্থাপিত হবে, সেদিন এদেশ বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অস্তিত্ব ফিরে পাবে। ফিরে পাবে মহান সংবিধানের অকৃত্রিম অস্তিত্ব, যা জাতির জনকের পবিত্র বিশ্বাস ছিল।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন এবং একাত্তরের ঘাতকদের একে একে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে কলঙ্কমুক্ত হয়েছে বীর বাঙালি।

বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উচ্চারিত বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের মূর্তরূপ 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির জনকের মহান আত্মদানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক: সাংবাদিক

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

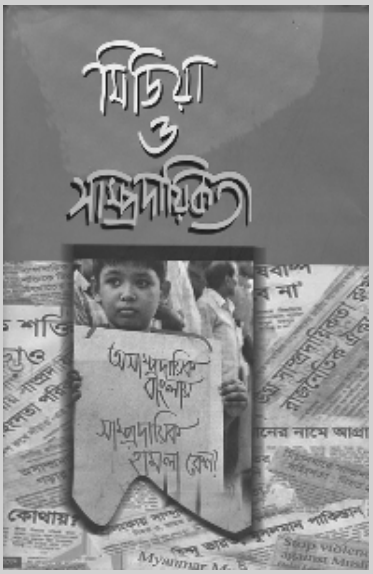

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাহসী সহোদরা শেখ হাসিনা শেখ রেহানা

বোরহান বিশ্বাস

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে জাতি। দেশের বাইরেও এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারেননি কেউ। কিন্তু থেমে ছিলেন না জাতির জনকের দুই কন্যা– শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তাঁরা বিশ্বমানবতার কাছে পিতৃহত্যার বিচার চেয়েছিলেন। ইতিহাসের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বিশ্বকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। দুবোনের প্রাণান্তকর সেই প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ঘন কালো মেঘ সরে গিয়ে নতুন ভোরের সূচনা হয়েছিল। বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতায় গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল হত্যাকাণ্ডের প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া। সুদূর স্টকহোম থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে দাবি উঠেছিল, কালক্রমে তা ডালপালা ছড়িয়েছে সর্বত্র। বিস্তৃত হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দাবির মিছিল। রব উঠেছে– 'জাতি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চায়'। হত্যাকাণ্ডের দাবি এবং বিচারিক কাজের মধ্যকার দীর্ঘ পথটি মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ২১ বছরের দুঃসহ যন্ত্রণা আর গ্লানি ছিল তার পরতে পরতে।

'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথম আবেদন রাখা হয় ১৯৭৯ সালের ১০ মে। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে এটি পেশ করেছিলেন কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। সেদিন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সর্ব

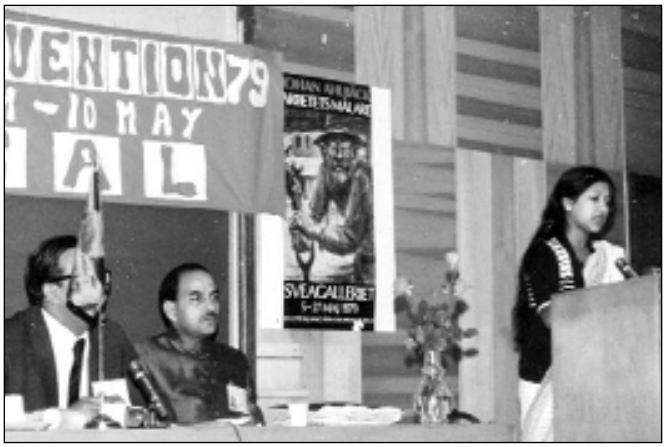

ইউরোপীয় বাকশালের এক সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তখন ভারত থেকে সুইডেনে গিয়ে সম্মেলনে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরে ইউরোপীয় নেতারা শেখ হাসিনার প্রতিনিধিত্ব করতে শেখ রেহানাকে অনুরোধ করেন। দিল্লি থেকে ফোনে শেখ হাসিনা বোনকে সম্মেলনে যেতে বলেন। অনুষ্ঠানে কী বলতে হবে, সে বিষয়েও তিনি টেলিফোনে বোনকে নির্দেশনা দেন।

ওই সম্মেলনে প্রধান অতিথি শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁর পাঠানো বাণী পাঠ করেন শেখ রেহানা। তাঁর পক্ষে বক্তব্যও দেন তিনি। কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে শেখ রেহানার সেটাই ছিল প্রথম বক্তব্য। আন্তর্জাতিক ওই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার কাছে প্রথমবার '৭৫-র কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি তোলা হয়। সেদিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, জাতিসংঘ মহাসচিব, হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান, আমেরিকা কংগ্রেসের হিউম্যান রাইটস কমিটির চেয়ারম্যান, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের প্রধানদের কাছে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচারের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানানো হয়।' (অস্ট্রিয়া প্রবাসী ও সাংবাদিক এম নজরুল ইসলামের নিবন্ধ থেকে সংকলিত)।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে লড়েছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার থমাস উইলিয়ামস। শেখ রেহানা তাকে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলা পরিচালনার বিষয়ে টেলিফোনে দিল্লিতে বড়বোনের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

১৯৮০ সালের ২০ জানুয়ারি সেন্ট্রাল লন্ডনের কনওয়ে হলে সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। ড. শফিক সিদ্দিক সভাপতি পদে প্রস্তাব করেন স্যার থমাস উইলিয়ামসের নাম, যা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যাদের সম্মতিতেই ড. শফিক সিদ্দিক আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন এই ব্রিটিশ আইনজীবীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

পরে স্যার থমাস উইলিয়ামসের সম্মতি নেওয়ার জন্য ওই বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে 'হাউস অব কমন্স'-এ গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শেখ রেহানা ও ড. শফিক। তারা তাকে জানান, বিদেশে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি পদের জন্য তাকে মনোনীত করা হয়েছে। প্রস্তাব শুনে স্মৃতিকাতর থমাস উইলিয়ামস বলেন, '১৯৬৮ সালে আমি ঢাকা গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা লড়তে। তারপর এলো ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। তখনো আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। সে-ও প্রায় ১০ বছর আগের কথা। তোমরা বাঙালি এখনো আমাকে মনে রেখেছ! আমি নিজে বঙ্গবন্ধুর একজন অনুরাগী, ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলাম।'

১৯৮০ সালের ৪ এপ্রিল শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে লন্ডন যান। জুনের মাঝামাঝি সময়ে একদিন স্যার থমাস উইলিয়ামস শেখ হাসিনাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমন্ত্রণ জানান। শেখ হাসিনা তার আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ওই সময় শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করার দায়িত্ব নিতে তাকে অনুরোধ করেন। এতে তিনি সম্মত হন। কিছুদিন পর আবার স্যার থমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে শেখ হাসিনা বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন।

শেখ হাসিনাকে গণসংবর্ধনা এবং বঙ্গবন্ধুর পঞ্চম শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে ১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট পূর্ব লন্ডনের মাইল্যান্ডস্থ ইয়র্ক হলে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বাঙালিদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের পর প্রবাসী বাঙালিদের এটিই ছিল সবচেয়ে বড়ো সমাবেশ। ওই সমাবেশে শেখ হাসিনা ছিলেন প্রধান অতিথি এবং স্যার থমাস উইলিয়ামস ছিলেন প্রধান বক্তা। সেদিন বেশ কজন ব্রিটিশ রাজনীতিক ও প্রখ্যাত আইনজীবী এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালির উপস্থিতিতে শেখ হাসিনার অনুরোধে থমাস উইলিয়ামস বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লন্ডনে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বিশ্বখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের 'হাউস অব কমন্স'-এর কাছাকাছি একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে স্যার থমাস উইলিয়ামস বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ঘোষিত ওই তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার থমাস উইলিয়ামস। অন্য সদস্যরা ছিলেন– নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত আইরিশ আইনজীবী মি. সিয়ান ম্যাকব্রাইড, লেবার পার্টির আইনবিষয়ক মুখপাত্র জেফ্রি থমাস এবং সলিসিটার মি. অর্বে রোজ। মি. অর্বে রোজকে কমিশনের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ওই সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও ড. কামাল হোসেনসহ অনেক প্রবাসী বাঙালি উপস্থিত ছিলেন। '৭৫-এর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে ওই তদন্ত কমিশন গঠন ছিল শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নিরন্তর চেষ্টার ফসল।

১৯৮১ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তদন্ত কমিশনের সদস্য জেফ্রি থমাস এবং সলিসিটার মি. অর্বে রোজ বাংলাদেশ সফরের জন্য লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ভিসার আবেদন করেন। ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কমিশনের সদস্যরা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে ঢাকা যাওয়ার জন্য অবিলম্বে ভিসা পাওয়া প্রয়োজন বলে সেদিন সকালে পাঠানো জরুরি বার্তার জবাবে বাংলাদেশ হাইকমিশন বলে, ভিসাসহ পাসপোর্টগুলো বিকেলে ফেরত দেওয়া হবে। বিকেলে হাইকমিশনে গিয়ে পাসপোর্টগুলো ফেরত পাওয়া সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কনসুলার বিভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও বেশ কিছুদিন তারা ভিসা পাওয়ার লক্ষ্যে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের তৎকালীন হাইকমিশনার আমিনুর রহমান সামছউদ দোহার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি তাতে। এমনকি তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের নির্দেশে এআরএস দোহা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ভিসা নামঞ্জুর সম্পর্কে কোনো চিঠি কিংবা কোনো রকমের ব্যাখ্যাও দেয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডে জেনারেল জিয়া জড়িত থাকা সম্পর্কে তথ্য চাপা দিতেই তদন্ত কমিশনের সদস্যদের ভিসা মঞ্জুর করা হয়নি।

আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের সদস্যদের বাংলাদেশ সফরের জন্য ভিসা নামঞ্জুরের প্রতিবাদে ১৯৮১ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় ব্যাপক প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। তদন্ত কমিশনের সদস্যদের বাংলাদেশে আসার অনুমতি আদায়ের দাবিতে ১৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দেশব্যাপী জনসমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জানুয়ারি লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে তদন্ত কমিশনের সদস্যদের বাংলাদেশের ভিসা নামঞ্জুর করার বিষয়টি হাউস অব লর্ডসে উপস্থাপন করেন, যা ৪ ফেব্রুয়ারি হাউস অব লর্ডসে আলোচিত হয়। ওই আলোচনায় তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটনসহ অনেকে অংশ নেন। ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং চার জাতীয় নেতার হত্যা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করে।

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ তনয়া ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৭৫-র ১৫ই আগস্টকে ঘিরে ঘরে-বাইরের ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং পরবর্তী দুঃসময় নিয়ে গত বছর ১৭ মে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে গণভবনে অনির্ধারিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। স্মৃতিকাতর প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতার একপর্যায়ে ড. কামাল হোসেনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরদিন ড. কামাল হোসেন এলেন বনে (জার্মানির শহর) হুমায়ুন রশিদের বাসায়। তিনি তখন জার্মানিতেই ছিলেন। রেহানা ছোট, সে বলল চাচা আপনি মোশতাকের মন্ত্রিত্ব নেবেন না। আপনি প্রেস কনফারেন্স করেন, এ হত্যার প্রতিবাদ করেন। হুমায়ুন রশিদ প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু উনি কোনো কথা বলতে রাজি হলেন না। হত্যার নিন্দা জানানোর একটা কথাও উনি বললেন না। হুমায়ুন রশিদ নিজে আমাদের নিয়ে প্রেসের সামনে বসেন এবং হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানান।'

কয়েক বছর আগে লন্ডনে একটি নিউজপোর্টালে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা খন্দকার মোশতাকের বিশ্বাসঘাতকতা ও তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের বিদেশে সংবাদ সম্মেলন আয়োজনে অনীহা প্রকাশের ঘটনার অকপট বর্ণনা দেন। তবে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জার্মানিতে সে সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীসহ অনেকের।

শেখ রেহানা বলেন, '১৫ আগস্ট কালরাত্রির হত্যাকাণ্ডের সময় বোন শেখ হাসিনার পরিবারের সঙ্গে তিনি ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের বাসায় অবস্থান করছিলেন। ঢাকায় সংঘটিত ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর সানাউল হক নার্ভাস হয়ে আমাদের সরিয়ে দিতে অস্থির হয়ে উঠেন। তবে তার মেয়েরা ছিলেন খুবই আন্তরিক। তারা আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, অভয় দিচ্ছিলেন। জার্মানিতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। পরে শুনেছি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকেও টেলিফোন করে সানাউল হক বলেছেন, এসব ঝামেলা আপনি আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি এই ঝামেলা সরান। সানাউল হকের বাড়ি থেকে আমরা বের হয়ে এলাম।

তখন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ফেরেশতার মতো আভির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রাসেলস ও জার্মানির বর্ডারে তিনি আমাদের জন্য গাড়ি পাঠালেন। আমরা সোজা 'বন' গিয়ে তার বাসায় উঠি। চৌধুরী ও তার স্ত্রী দুজনই আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আমাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে তাদের। কয়েকজন বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি ছেলে বনে হাইকমিশন ভবন ঘেরাও করে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানোর জন্য চৌধুরীকে চাপ দেয়। আমাদের বের করে দিতেও বলে তাকে। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এমন চাপে নতি স্বীকার না করে উল্টো তাদের বলেন, এই ভবন এখনো বাংলাদেশ। ঢাকা থেকে আমি কোনো নির্দেশ পাইনি। তোমরা যদি বেশি ঝামেলা করো আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব। ছেলেরা তখন চলে যায়।'

সাক্ষাৎকারে রেহানা জানান, 'গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ক্ষমতা দখলকারীদের নির্দেশে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তার বাসায় হাসিনা-রেহানাকে বন্দি করে রেখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা তখন ভিড় জমান চৌধুরীর বাসার সামনে। তারা জানতে চান আসলেই হাসিনা-রেহানা বন্দি কি না। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তখন আমাদের বললেন, তোমরা কি একটু জানালার কাছে গিয়ে তোমাদের প্রকৃত অবস্থান জানাবে? আমরা তখনই জানালার কাছে গিয়ে সাংবাদিকদের বললাম, আমরা এখানে আশ্রয় পেয়েছি, বন্দি নই। আমাদের কথা শুনে তারা চলে যান।

ড. কামাল হোসেন ওই সময় জার্মানিতে আসেন। তিনিও খুব কান্নাকাটি করছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি তখন দেশের বাইরে সফরে ছিলেন। ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে তার কাছেও সঠিক কোনো খবর ছিল না। তাকে একটি প্রেস কনফারেন্স আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে বললাম, চাচা আপনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, একটি প্রেস কনফারেন্স করে বিশ্বমিডিয়াকে প্রকৃত অবস্থা একটু বলুন। আমাদের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে ডিফেন্ড করতে অনুরোধ করুন। তিনি আমার অনুরোধের গুরুত্ব দিলেন না। হয়তো ছোট মানুষ হিসেবে এই অনুরোধের কোনো গুরুত্ব নেই বলে তিনি ভেবেছিলেন। তবে ওই সময় যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন একটি প্রেস কনফারেন্স করতেন, তখন পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম হতো।'

রেহানা বলেন, 'লন্ডনে এসে বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত কমিটি গঠনের চেষ্টা করতে লাগলাম। নোবেল বিজয়ী সিয়ান ম্যাকব্রাইড, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মতিন চৌধুরী, গাফ্ফার চাচা, ড. কামাল হোসেনসহ অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। অনেক চেষ্টার পর সাক্ষাৎ পেলাম স্যার থমাস উইলিয়ামসের। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সব ধরনের সাহায্য করব। কিন্তু নিজে কিছুতে থাকতে পারব না। কারণ আমি এখন কুইন্স কাউন্সিলর।'

১৯৭৯ সালে সুইডেন যান শেখ রেহানা। সেখানেই প্রথম শেখ হাসিনার নাম দিয়ে ব্যানার টানিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। রেহানা বলেন, 'আমার তখন পাসপোর্ট নেই। পাসপোর্ট এর আগেই কেড়ে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া একটি ট্রাভেলস ডকুমেন্টস নিয়ে যাই সুইডেন। এরপর ধীরে ধীরে সব এগোতে থাকে। আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্ডার ইনকোয়ারি কমিটি করলাম। এখানে দুজন আইনজীবী ঠিক করে দিলেন থমাস উইলিয়ামস। আইনজীবীদের ঢাকা যাওয়ার টিকিটের পয়সা সংগ্রহ করা হলো প্রবাসী ভাইবোনদের কাছ থেকে। সাধ্যানুযায়ী সবাই দান করলেন এই তহবিলে। ঢাকায় রাজ্জাক ভাইরাও আনুষঙ্গিক সবকিছু ঠিক করে রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আর ঢাকা যাওয়া হয়নি। আইনজীবীরা যেদিন ভিসার জন্য হাইকমিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিন পুরো হাইকমিশনই বন্ধ করে রাখা হয়।' এটি ১৯৭৯ বা '৮০ সালের কথা। এরপরও হতাশ না হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত ও বিচারের দাবিতে তৎপরতা চালাতে থাকেন শেখ রেহানা।

সুইডেন থেকে ফিরে আসার পর লন্ডনে তার সাক্ষাৎ হয় মালেক উকিল, সামাদ আজাদ ও ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ওয়েস্ট মিনিস্টারের কাছে একটি রেস্টুরেন্টে প্রেস কনফারেন্স করেন। আওয়ামী লীগ নেতা আতা খানের রেস্টুরেন্টে। ওই প্রেস কনফারেন্সে তিনি একটি লিখিত বক্তব্য দেন। সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের জবাব দেন ড. কামাল হোসেন।

শেখ রেহানা জানান, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি করে আমরা ক্যাম্পেইন শুরু করলাম। এই ক্যাম্পেইন নিয়েও কতজন কত বিদ্রুপ করল। অবশ্য কেউ কেউ সাহায্যও করেছেন। এর মধ্যে একজন শিপিং করপোরেশনের বড়ো অফিসার এ জেড আহমেদ আমাকে খুবই সাহায্য করেছেন। আব্বার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রুহুল কুদ্দুস ও মঈনুল ইসলামও আমার খোঁজখবর নিয়েছেন নিয়মিত।'

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য গঠিত কমিশন ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রথমবার বৈঠকে বসে। এর সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবেন তারা। পরে কমিশনের সদস্যরা বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং ভিসার জন্য লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসের শরণাপন্ন হন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে কমিশনের পক্ষে বাংলাদেশের জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন জেফরি থমাস এবং তার এক সহকারী।

যুক্তরাজ্যের এই কমিশন ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ওই প্রতিবেদনে তারা বলেছিল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইনি ও বিচার প্রক্রিয়াকে তার নিজস্ব পথে এগোতে দেওয়া হয়নি। এজন্য দায়ী ছিল তৎকালীন সরকার।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিসা না পাওয়ায় সফর হয়নি। কেন ভিসা দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে দূতাবাসের পক্ষ থেকে কিছু জানানোও হয়নি। দূতাবাসে কয়েকবার চিঠি দিলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ 'SHEIKH MUJIB Murder Enquiry: PRELIMINARY REPORT OF THE ENQUIRY' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পুস্তিকা আকারে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়, যার মুখবন্ধ লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক ভোরের কাগজ

চিত্রকলায় বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও বর্তমান ভাবনা

গৌতম কুমার বিশ্বাস

বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সহস্র বছরের। তার সূত্র ধরেই এগোতে গেলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে চোখ বোলাতেই হবে। ছবি কেন আঁকবে, কারা আঁকবে, কী প্রয়োজনে ছবি আঁকবে– এমন অনেক প্রশ্ন মনে তোলপাড় করাই স্বাভাবিক। তাই প্রথমে ভাবব শিল্পের উদ্ভব নিয়ে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আদিম মানুষের হাত ধরেই শিল্পের ধারণা এসেছে। হোমোসাপিয়েন্স মানুষ চারপাশে যা দেখেছে, তা-ই তার শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। হোমোসাপিয়েন্স কথাটির অর্থ হলো বুদ্ধিমান মানুষ। এভাবেই শিল্পকলার শুরু। তাহলে কেন ছবি এঁকেছে আদিম মানুষেরা? ঘর সাজানোর জন্য, না কি দামি শিল্পী হওয়ার জন্য? এসব উচ্চতর ভাবনা বা ধ্যানধারণা আদিম মানুষের ছিলই না। তবে তাদের দুটি প্রবৃত্তি সবচেয়ে প্রখর ছিল। একটি জৈবিক ক্ষুধা, অন্যটি মানসিক ক্ষুধা। পেটের ক্ষুধা মেটাত পশুর মাংস খেয়ে আর মনের ক্ষিধে মেটাত ছবি এঁকে। আঁচড় কেটে কেটে পাথরের দেয়ালে সে তার আদল ফুটিয়ে তুলত। এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেই হয়তো আদিম মানুষের ছবি আঁকা শুরু। তাহলে এরূপ চিন্তা আসতেই পারে যে, বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে সবচেয়ে পুরোনো ছবি কী, ভাস্কর্য কী, স্থাপত্য ও শিল্পকলা কোথায় গেলে খোঁজ মিলবে। আদিম মানুষের পর কয়েক হাজার বছর কেটে

গেছে। পৃথিবীর কত উত্থানপতন হয়েছে। কত জাতি, সভ্যতা এসেছে, আবার বিলীন হয়ে গেছে। সব সভ্যতা সম্পর্কে না জানলেও অনেক সভ্যতার কথা আমরা জেনেছি এবং উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এর মূল উৎস হচ্ছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কারুকলা। যে কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাচ্ছে এবং পাওয়া যাবে। খ্রিষ্টের জন্মের পর মৌর্য বংশ, পাল বংশ, সেন বংশ থেকে শুরু করে মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর প্রাসাদে চিত্রকরদের নিয়োগ দেওয়া হতো। সেই সঙ্গে শিল্পচর্চা বিদ্যমান ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে। এভাবে যখন মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সহজ হলো, তখন মনের কিছু কিছু অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি একত্রিত হয়ে শিল্পিত রূপ নিল। এ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পের জাগরণ হলো। বলা হয়ে থাকে, শিল্পকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা, এর কোনো বয়সসীমা নেই। তাই হয়তো ৭০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবি এঁকে ভারতীয় আধুনিক চিত্রশিল্পের জনক হয়ে উঠেছেন। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশ থেকে প্রথম শিল্পী হয়ে ওঠা জয়নুল আবেদিন তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে কালি-কলমের রেখা দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তুলির শক্তির কথা। ২০০ বছর শাসনের পর যখন ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলো, তখন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পথিকৃৎ শিল্পীদের নিয়ে উদ্যোগ নিলেন চারুকলা চর্চাকেন্দ্র স্থাপনের। চারুকলা আন্দোলন নিছক ছবি আঁকা শেখার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়। লাখো বাঙালির অন্যান্য শিল্পকলা ভাষা ও সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে একটি দেশজ ও যুগোপযোগী সংস্কৃতিচর্চার শক্ত ভিত তৈরি করা।

১৯৪৮ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলাকে' রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে চিত্রশিল্পীরা নানাভাবে একাত্ম হয়ে পোস্টার-ফেস্টুনে মুখরিত করে তুলেছিলেন। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর শানিত ভাষণ শুনে চিত্রশিল্পীরা একজোট হয়ে আলোচনায় বসলেন, তারা আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তাই শিল্পীরা ছবি ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ্যেই স্বাধীনতাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে সেই সময়ে শিশু-কিশোররা তিন শতাধিক ছবি আঁকে। পাকিস্তানিরা কীভাবে এদেশের গ্রামাঞ্চল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে, কীভাবে নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মা, বোন, ভাইকে হত্যা করেছে, কীভাবে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে– তারই বাস্তব চিত্র রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে সব চক্রান্তকারীর ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বর্ণিল সংস্কৃতির ঐতিহ্যপূর্ণ রূপসি বাংলাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলেন। জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রতি আলাদাভাবে নজর দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য প্রতীকী ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ৭০টি বাছাই করা ছবি দেখে হতভম্ব হয়ে শিশুদের উদ্দেশে বলেছিলেন, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদের ভালো লাগার বিষয় হলো চিত্রকলা, যা শিশুমনের সৃজনশীল বিকাশ ঘটায়। মানুষের মনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ হলো শিল্পকলা। শিল্পী তাঁর কল্পনা ও মেধার সঙ্গে দক্ষতা ও রুচির সমন্বয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন। শিল্পী তাঁর সৃষ্টির আনন্দ থেকে শিল্প সৃষ্টি করেন বলে কোনো বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে ফেলা যাবে না। শিল্পীর কাজ হচ্ছে শিল্পকলার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করা এবং কল্পনার পরিধি বাড়িয়ে তোলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাছাই করা ৭০টি ছবি শিশুশিল্পীরা রোকনুজ্জামান দাদা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দেখিয়েছিল গণভবনে। শিশুদের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের প্রশংসা করেন। শিশুদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সেদিন সাড়ে তিন ঘণ্টা আনন্দে কাটান এবং গল্পগুজব করেন। বঙ্গবন্ধু যখন জানলেন শিল্পাচার্য ছবিগুলো লন্ডনে নিয়ে যাবেন প্রদর্শনী করতে, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, 'আমি এখনই লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনের কর্মকর্তাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তাঁরা যেন সব ধরনের সহযোগিতা করেন। তিনি আরো বললেন, শিশুদের আঁকা ছবিগুলো বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের শিশুরাও যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরবের খবর বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে, এটা আমাদের জন্য বিশাল গৌরবের।

এভাবেই বাংলাদেশের শিশুরা ছবি এঁকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর কাছে।

তিনি আরো বলেন, ছবি আঁকার ফলে শিশুর মনে সুন্দর চিন্তার উদয় ঘটে, বিবেককে পরিমার্জিত করে সুন্দরের পথে ধাবিত হয় এবং আবেগ, আনন্দ, দুঃখ, ক্ষোভ, অনুভূতিকে নান্দনিক অর্থে আলোড়িত করে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও মতুর্জা বশীরকে আহ্বায়ক করে একটি বাস্তবায়ন কমিটি করে ১০ দিনে কয়েকশ' ছবি ও পোস্টার এঁকে চিত্রশিল্পীরা ১৯৭১ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শহীদ মিনার থেকে বিপ্লবী চিত্রের মিছিল বের করলেন অভিনব কায়দায়।

বলা হয়ে থাকে, চিত্রকলা সর্বকালের সব মানুষের ভাষা। শিল্পীর চোখে বঙ্গবন্ধু নিজেই একটা নিঃস্বর্গ ক্যানভাস। তাঁকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে আঁকাই একজন শিল্পীর কাজ।

লেখক: শিক্ষক ও চিত্রকর

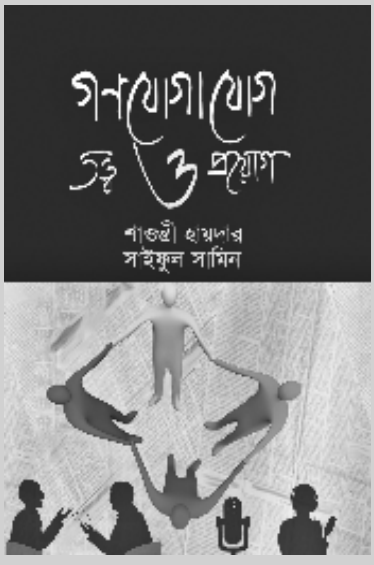

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও প্রাসঙ্গিকতা

বিনয় দত্ত

১.

তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

.....

সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দুর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

নির্মলেন্দু গুণের 'সেই রাত্রির কল্পকাহিনী' কবিতায় কবি একজন মহাপুরুষের বিদায়ের ক্ষণকে অঙ্কিত করেছেন পদ্যের ছন্দে যাতনার মধ্য দিয়ে। এ যাতনা একজন গগনবিদারী কণ্ঠস্বরের থেমে যাওয়ার, একজন গিরি-পর্বতসমান মানুষের বিদায়ের, একটি জাতির মহান নায়কের চিরবিদায়ের। কবি আক্ষেপ করে তার কবিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙালির বিদায়কে মুহুর্মুহু করে তুলেছেন তার লেখনীতে।

পৃথিবীর মানুষ আজ বাংলাদেশকে চিনে, জানে। বাংলাদেশের আচার-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে জানে। আর জানে বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জন্য কত বড়ো সম্পদ ছিলেন, তা আমরা আজ তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিটি ক্ষণে উপলব্ধি করতে পারছি। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মের জন্য বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মহান মহানায়কের দরকার, যা আমাদের ছিল। তাই আমরা আজ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি, নিজের মাতৃভাষায় আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক নাম, যার গোটা জীবন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে। টুঙ্গিপাড়ায় এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান স্কুলজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কৈশোরে তাঁর রাজনীতির দীক্ষাগুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবার কারাবরণ করেন শেখ মুজিব। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়াকালীন তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। ওই সময় থেকেই নিজেকে ছাত্র-যুবনেতা হিসেবে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন, যা পরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে আওয়ামী লীগ নাম নেয়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণদাবি আদায়ের আন্দোলনের নেতৃত্বে শেখ মুজিব ছিলেন।

১৯৬৬ সালে তিনি ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেন, যার ফলে ১৯৬৮ সালে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হতে হয়। ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের ম্যান্ডেট লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এ নির্বাচনী বিজয়কে মেনে নেয়নি। ১৯৭১-এর মার্চে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে রচিত হয় অমর কবিতা। এই অমর কবিতায় উচ্চারিত হয়– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২

অমর কবিতার জন্মক্ষণটি সবাই স্মরণ করছে শ্রদ্ধাভরে। মহাকাব্যের সেই কবির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি প্রতিটি ক্ষণে। অমর কবিতার জন্মক্ষণটি কিন্তু খুব সুগম ছিল না। বরং ক্ষণটি ছিল কণ্টকময়, অস্থির, দুর্গম। কবির ভুল শব্দের মধ্য দিয়ে রচিত হতে পারত ভিন্ন ইতিহাস। ভুল শব্দে ভিন্ন ইতিহাস রচিত হয়নি, বরং রচিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস। 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতায় কবি শামসুর রাহমানের মতো আমিও বলতে চাই–

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি॥

মহান নেতার বিচক্ষণতা, ভেতরকার আর্তনাদ, নির্যাতিত মানুষের কান্নার হাহাকার, রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার দৃশ্যপট, বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের তীব্র শব্দ কবিকে করেছে আরো পরিশুদ্ধ। এই ইতিহাস একদিনের নয়, এ ইতিহাস দীর্ঘ তেইশ বছরে নিপীড়িত, বঞ্চিত হওয়ার। এ ইতিহাস শোষণের, শোষিত হওয়ার। এই ইতিহাস অসংখ্য স্বাধীনতাকামী মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস।

ইতিহাসের সেই অমর কাব্য শোনার জন্য সেই দিনের অপেক্ষা সবার। কখন আসবে স্বাধীনতার ঘোষণা বহনকারী সেই কবি? যিনি বাঙালির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। যিনি সবার অজান্তে নিজের জীবনের প্রতিটা রক্তবিন্দু উৎসর্গ করে রেখেছেন। 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' এই কবিতায় কবি নির্মলেন্দু গুণের মতো আমিও বলতে চাই–

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে–
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

৭ই মার্চের ১৯ মিনিটের সেই অমর কবিতার প্রতিটি শব্দ এত গভীর, এত দৃপ্ত, এত বেশি পরিমাণে সবাইকে চিন্তার খোরাক দেয় যে তা বারবার শ্রবণের আগ্রহ তৈরি করে। এই তীব্র আগ্রহ নিবারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন রেসকোর্স ময়দানে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ হেঁটে, বাস-লঞ্চে কিংবা ট্রেনে চেপে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল বিশাল ময়দান। মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক নাম, যার গোটা জীবন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে। ... ছাত্র থাকা অবস্থায় তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবার কারাবরণ করেন শেখ মুজিব

পড়েছিলেন উত্থিত বাঁশের লাঠি হাতে সমবেত লাখ লাখ বিক্ষুব্ধ মানুষ। বাতাসে উড়ছিল বাংলার মানচিত্র আঁকা লাল সূর্যের অসংখ্য পতাকা। নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে আমি বলতে চাই–

... এই মাঠে ছুটে এসেছিল
কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে
এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক, পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে
এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক, হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে
এসেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা,
ভবঘুরে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।

এ কবিতায় বঙ্গবন্ধু ব্যক্ত করেছেন বাঙালির দুঃখের কথা, নিজের আকুলতার কথা, বাঙালির অধিকারের কথা। অমর কবিতার মহান কবি নিজেকে উদারভাবে তুলে ধরেছেন কোটি কোটি মানুষের সামনে। এই কবিতায় একদিকে যেমন দুঃখের কথা উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিলে বাঙালি কীভাবে তা হরণ করে নেবে তার কথাও।

প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

১০৩টি লাইনের সেই অমর কবিতায় শত্রুপক্ষকে এত নিখুঁতভাবে সুকৌশলে কবি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যা ইতিহাস স্মরণে রেখেছে। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর আচরণ বঙ্গবন্ধুর একদমই পছন্দ না; কিন্তু তিনি নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঠিকই তা দূরদর্শিতা দিয়ে। শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীকে তিনি অধিকারের স্বরে বলছেন–

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো,
কেউ কিছু বলবে না।
গুলি চালালে আর ভালো হবে না।
সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।
বাঙালি মরতে শিখেছে,
তাদের কেউ দাবাতে পারবে না।

একটি দেশকে সতর্কবাণী দেওয়া ছাড়াও নিজেদের দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতি নির্দেশনাও ছিল স্পষ্ট। নিরপরাধ, নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে একতাবদ্ধ করার জন্য এই একটি ভাষণই ছিল যথেষ্ট। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু দলমত, ধর্ম-বর্ণ সব ভুলে সবাইকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। যে কোনো মূল্যে নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করতে হবে।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে
আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকবা।
রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

একজন নির্লোভী স্বার্থহীন মানুষ, যিনি শুধু বাঙালির স্বাধীনতার চিন্তায় রত ছিলেন। যার চিন্তার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজ করছে কীভাবে বাঙালি জাতিকে কুলাঙ্গার পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুকে বশে আনার জন্য পাকিস্তানিরা অনেক কিছুই করেছে, অনেক লোভ-লালসা দেখিয়েছে; কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর জায়গা থেকে সরেননি। জনগণের বিশ্বাসকে তিনি পরম পবিত্র মনে করতেন। তিনি জানতেন, এই বিশ্বাস একবার নষ্ট হলে তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

ভাইয়েরা আমার, আমার ওপর বিশ্বাস আছে?
আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই।
প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি,
ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেনি।
আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন।
সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম,
রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো; মনে আছে?
আজও আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।

বঙ্গবন্ধু নিজে যেমন আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি জনগণের ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানতেন, তাঁর নির্দেশ কেউ অমান্য করবে না। তিনি নিজের দক্ষতা, যোগ্যতা দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন। এই আস্থার কারণেই তিনি সাত কোটি জনগণকেই যা-ই বলবেন, জনগণ তা-ই করবেন। কারণ বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকার ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না।

আমি বলে দিতে চাই,
আজ থেকে কোর্ট-কাচারি, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট,
অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সকল কিছু
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
কোনো কর্মচারী অফিস যাবেন না। এ আমার নির্দেশ।
.....
এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে-শুনে চলবেন।
দরকার হলে সমস্ত ঢাকা বন্ধ করে দেয়া হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র অলিখিত ভাষণ, যা বঙ্গবন্ধু নিজের বোধ থেকে বলেছেন এবং কোটি কোটি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার দাবিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একাত্তরের রেসকোর্স ময়দানের সেই ভাষণটি আসলে ছিল মহাকাব্য। মার্কিনরাও এই ভাষণ স্টাডি করে তার মধ্যে কবিতার সন্ধান পেয়েছিল। নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে আমি বলতে চাই–

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে ,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

৩

৭ই মার্চের ভাষণ আসলে ভাষণ নয়। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে আমরা একজন বিচক্ষণ ত্যাগী নেতাকে দেখতে পাই, যিনি তাঁর জীবন শত্রুপক্ষের কাছে সমর্পণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই ভাষণের পর যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'নিউজউইক' বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যা দিয়েছিল।

ব্রিটেনের ইনস্টিটিউট অব কমনওয়েলথ স্টাডিজের অধ্যাপক জেমস মেনর বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালির স্বাধীনতার কৌশলী ঘোষণা। তার মতে, স্বাধীনতার এই ঘোষণায় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের কৌশল অবলম্বন করার বিভিন্ন কারণ ছিল। এই কৌশল অবলম্বন করে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।'

লন্ডনের দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে 'আন্ডারস্টান্ডিং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: দ্য হার্ড রোড টু বাংলাদেশ'স ইনডিপেনডেন্টস অ্যান্ড দ্য মিনিং অব মার্চ সেভেনথ' শীর্ষক লেকচারে প্রফেসর মেনর বলেন, '৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের সমাবেশে হামলা চালানোর জন্য পাকসেনারা প্রস্তুত, এমন তথ্য জানার পর শেখ মুজিব চাননি তার প্রিয় বাঙালির রক্তে প্লাবিত হোক রেসকোর্স ময়দান। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি যে আলোচনার পথ খোলা রাখতে চান, এমনটি বোঝানোর জন্যই ৭ই মার্চের বক্তব্যে কৌশল অবলম্বন করেন।

অধ্যাপক মেনর আরো বলেন, 'শেখ মুজিব খুবই দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। জনগণের মনোভাব তিনি খুবই ভালো বুঝতেন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। স্বাধীনতার জন্য নিজ দেশের জনগণকে দীর্ঘ সময় নিয়ে তৈরি করেছিলেন তিনি এবং উপযুক্ত সময় আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাধীনতার ডাক দেন। নিজের জীবনের চেয়েও সহকর্মী ও জনগণের নিরাপত্তাকে শেখ মুজিব গুরুত্ব দিতেন বেশি।'

মার্কিন মুলুকের আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের ভাষণ, এঙ্গেলসের কাল মার্কসের অনুষ্ঠানের ভাষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালের বক্তৃতা, কাজী নজরুল ইসলামের ১৯৩২ সালের ৫ নভেম্বর সিরাজগঞ্জে তরুণদের উদ্দেশে ভাষণ, মহাত্মা গান্ধীর কুইট ইন্ডিয়া ভাষণ, বেগম রোকেয়ার বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, মার্টিন লুথার কিং-এর ওয়াশিংটনে 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' শীর্ষক বক্তৃতা, ড. শহীদুল্লাহর চট্টগ্রামে ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ ও শেরেবাংলার ১৯৫৮ সালের সমাবর্তনে ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ বিশ্ববাসী তথা বাঙালির হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। তবে এসব ভাষণের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পূর্ণ আলাদা এবং প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। নানাভাবে নানাজন এ ভাষণের মূল্যায়ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে লন্ডনের সানডে টাইমস বঙ্গবন্ধুর নাম দিয়েছিলেন 'এ পোয়েট অব পলিটিক্স'।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচির অধীনে আন্তর্জাতিক তালিকায় মোট ৭৮টি দলিলকে মনোনয়ন দিয়েছে। এ তালিকায় ৪৮ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আন্তর্জাতিক তালিকাই মূলত মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড।

৪

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রেরণা। ৭ই মার্চের ভাষণই নিরস্ত্র একটা জাতিকে সশস্ত্র হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা তাঁর অনুপস্থিতিতে গোটা জাতিকে ৯ মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা, সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিল। ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালির আরাধ্য স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু একবাক্যে বাঙালির ভবিষ্যৎ রচনা করে বলেছিলেন, বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আজকের পদ্মা সেতু। আমরা এখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। এখন বিশ্বের দুয়ারে 'বাংলাদেশ' শুধু একটি নামই নয়। বাংলাদেশ এখন ঘুরে দাঁড়ানোর অনন্য উদাহরণ। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থান বিশ্বদরবারে প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দেখার মতো।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু যে অমর কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন তাতে তিনি অনেক ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনাই দিয়ে গিয়েছিলেন। একদিকে যেমন বাঙালির আগামী দিনের পথ পরিকল্পনার কথা বলা আছে, অপরদিকে ছিল প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা। এখনো যে কোনো সংকট সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে আমার উত্তরণের পথ বলে মনে হয়। মনে হয় এই ভাষণই সব অন্ধকার মোচনের একমাত্র উপায়।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুর শেষ বিকেল

মো. আবদুল রকিব খান

‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য!
উচ্চ যেথা শির!’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যটির বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ঘাতকদের সামনে চিরাচরিত নিয়মে হাতে পাইপ (সিগারেট) নিয়ে নির্ভয়ে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সারা জীবন যেভাবে মৃত্যুকে ভয় করেননি, তেমনি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে শাহাদতবরণ করেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারের পাশে কবর খোঁড়ার সংবাদ শুনে যিনি বলতে পারেন আমার মৃত্যুর পর মৃতদেহ দেশের মানুষের কাছে পাঠিয়ে দিও।

যার নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশের সৃষ্টি। যিনি কোনো দিন কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। যে নাম শাশ্বত, সত্য, চির স্মরণীয়, যার ডাকে হিন্দু-মুসলিম, খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ সব বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। যার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল অগ্নিঝরা বাণী–

এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম

তাঁকে হত্যা করে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল।

১৪ই আগস্ট ১৯৭৫: অনেকের মনে থাকার কথা, ১৪ই আগস্ট দুপুরের কাছাকাছি কোনো একসময়

ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার নোয়াখালীর চরাঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়। এটা কি নাশকতামূলক কাজ ছিল, নাকি কেবল দুর্ঘটনা? এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন বঙ্গবন্ধু (রাষ্ট্রপতি)। বারবার সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। ওই দিন দুপুরে ইউজিন ডেভিড বোস্টার আমেরিকার অ্যাম্বাসেডর গণভবনে এসেছিলেন সাধারণ পোশাক পরেই। এমনকি টাইও পরেননি। এ অবস্থায় পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার কথা নয়। ফরাসউদ্দিনের রোমে দীর্ঘসময় বসেছিলেন। ফরাসউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন কি না? তিনি না বলে চলে গেলেন। দিনটা কিন্তু ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫। এর ১৭-১৮ ঘণ্টার পর হত্যাকাণ্ড ঘটে।

কে এই বোস্টার?

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর বডিগার্ড মো. আবদুস সালাম নিরাপত্তাবিষয়ক এক প্রশিক্ষণে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অধীনে ইংল্যান্ডের সাউথ সিতে যান। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে Mr. Kaven নামের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (External Affairs) দীর্ঘ আলাপ করেন। বিষয় ছিল আমেরিকা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইউজিন বোস্টারকে পাঠাচ্ছে। Kaven-এর ভাষায়– He is killer. চিলির আলেন্দে হত্যার সঙ্গে বোস্টার জড়িত ছিল। কথাবহ পরামর্শ দিলেন, প্রেসিডেন্টকে বলবে, তাকে এক্সসেপ্ট না করার জন্য। আবদুস সালাম বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উত্তরটা ছিল সাদামাটা, 'ভিক্ষুকের পছন্দ থাকতে নেই।' ডেভিড বোস্টার ইন্দোনেশিয়ার জাতির পিতা শোয়ে কর্ন সরকারকে উৎখাত করে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করার নীলনকশা নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাস

বঙ্গবন্ধু কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কেউ তাকে অসম্মান বা অপমান করতে পারে। কারণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি অফিসার ও সৈন্যরা অবজ্ঞা ও ঘৃণার জীবন বয়ে বেড়াত। সেখানে তিনি তাদের বিশ্বব্যাপী বীরের মর্যাদায় ও বীর সেনাবাহিনীর মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাদের কেউ তাকে হত্যা করতে পারে, এমন কথা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না।

১৫ই আগস্ট ফরাসউদ্দিন ও মনোয়ার প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা। তাঁদের বিদায় উপলক্ষ্যে গণভবনে বড়োসড়ো ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রায় সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এমন তো নয় যে, তারা চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। এরকম অনেকেই প্রশিক্ষণে বিদেশে গিয়েছেন। বিশেষ করে ওই দিনই এত বড়ো আয়োজন কেন?

রাত ৮টা ৫ মিনিট, বঙ্গবন্ধু ৩২নং বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশে উঠে পড়লেন। বঙ্গবন্ধু সবসময় মূল বিল্ডিংয়ের পেছনের সিঁড়ি তথা পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়ে আসা-যাওয়া করতেন। প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বঙ্গভবন পুলে কিছু গাড়ি রাখা থাকত। বঙ্গবন্ধু সবসময় যে গাড়িটি ব্যবহার করতেন, সেটা ছিল মার্সিডিজ-৩০০ অটো। কালো রঙের। সেদিন পুল থেকে কালো রঙের একটা সেভ্রলেট পাঠানো হলো। বঙ্গবন্ধুর অপছন্দের গাড়ি। গাড়িটা দেখে বঙ্গবন্ধু রাগারাগি করলেন। গাড়িটি মিরপুর রোড হয়ে ৩২নং বাড়িতে ঢুকবে, তখনই ঘটল অঘটন। অর্ধেকটা গাড়ি ভেতরে বাকি অর্ধেকটা ৩২ নং রোডের ওপরে, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত রাগান্বিতভাবেই গাড়ি থেকে নামলেন, যা স্বাভাবিক। গাড়িতে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাশারুল হক, চিফ সিকিউরিটি অফিসার মহিউদ্দিন, ফলোকারে ছিলেন আবদুস সালাম ও মহসিন। পাজামাটা ধরে দুলতে দুলতে দোতলায় উঠলেন। সিঁড়িতে যে জায়গায় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সে জায়গায় এসে বললেন, এবার আপনারা যান, আসসালামু আলাইকুম।

ষড়যন্ত্র: নব্য স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সংকট থেকে মুক্ত করে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু যখন দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, সেসময় স্বাধীনতাবিরুদ্ধ চক্র ও হঠকারী রাজনীতিবিদদের দল দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। অস্থির করে তোলে দেশকে। ফলে দেশ গঠনের পাশাপাশি এদের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ষড়যন্ত্রকারী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধেও।

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ (ডিজিএফআই) তখন পর্যন্ত পাকিস্তান প্রত্যাগত গোয়েন্দাদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে ছিল। ফলে খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়। হত্যার পরিকল্পনায় বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। এমনকি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নিরাপত্তাকর্মীদের ভেতরেও অনুপ্রবেশ ঘটাতে সমর্থ হয়। ডালিম-ফারুক-রশীদরা সস্ত্রীক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত করত। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করত। বঙ্গমাতাকে, আম্মা/খালাম্মা বলে সম্বোধন করত। তাঁর হাতের খাবার খেয়ে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করত। বঙ্গমাতার পরম স্নেহধন্য হয়ে উঠেছিল তারা। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত কর্মচারী, দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত আবদুলসহ অনেককেই তারা হাত করে ফেলেছিল। আবদুল নিজের অজান্তেই খুনিদের সহায়তা করছিল।

প্রশিক্ষণের নামের টোপ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত কিছু অফিসারকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, কর্নেল মালেকসহ আরো অনেকেই। রক্ষীবাহিনীর উপপ্রধান ব্রিগেডিয়ার সাবিহ উদ্দিনকে মেজর জিয়ার নির্দেশে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে সামরিক এক্সারসাইজ দেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

বিশেষ উদ্দেশ্যে কর্নেল জামিলকে সামরিক সচিবের পদ থেকে সরিয়ে গ্যাপ তৈরি করা হয়। এই গ্যাপে এসে বসলেন ব্রিগেডিয়ার মাশহারুল হক। যাকে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর কুয়েত/কাতারের রাষ্ট্রদূত করা হয়েছিল। কর্নেল জামিলকে সামরিক সচিবের পদ থেকে সরিয়ে ল্যান্সার/আর্টিলারির কালো পোশাকধারীরা ৩২নং বাড়িটি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে যায়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে নতুনরা আসবে পুরোনোদের প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু ওইবারই প্রথম পরপর দুইবার (দুই মাস) একই ব্যক্তিদের ওপর ৩২নং বাড়ির দায়িত্ব ছিল। চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে ব্রিগেডিয়ার মাশহারুল হক কার ইশারায় এ কাজ করেছিল?

কে এই ব্রিগেডিয়ার মাশহারুল হক? তাকে কেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের পদে নিয়োগ দেওয়া হলো? তার নিয়োগ সম্পর্কে তখনকার সেনাপ্রধান কি কিছুই জানেন না? এটি কি বিশ্বাস করা যায়?

হত্যাকাণ্ড: ১৪ই আগস্ট রাত ১০টায় প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির যৌথ মহড়ায় ৬০০ সৈন্যকে নতুন এয়ারপোর্টে জড়ো করা হয়। তখনো সৈন্যরা জানে না তাদের কমান্ডারদের মনে কী আছে? ফারুক ও রশীদ অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছিল। যাতে সাধারণ সৈন্যরা ঘাবড়ে গিয়ে সব আয়োজন পণ্ড করে না দেয়। অন্যান্য সময়ের মতো গতানুগতিক মহড়া ভেবেছিল সৈন্যরা। মেজর ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সারের ২৮টি টি-৫৪ ট্যাঙ্ক মোতায়েন রয়েছে।

যে ৬০০ সৈন্যকে ব্যবহার করা হয় তাদের ওপর ফারুক ও রশীদের পরম আস্থা ছিল। তার প্রথম কারণ– ফারুক ও রশীদ তাদের কমান্ডিং অফিসার। দ্বিতীয় কারণ– বহুদিন পূর্ব থেকে তারা কৌশলে সৈন্যদের বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করে রেখেছিল। তৃতীয় কারণ– ফারুক ও রশীদ সাধারণ সৈন্যদের জন্য এমন একটা বক্তব্য / গল্প তৈরি করে রেখেছিল, যার মর্মাথ হলো ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সামরিক বাহিনীকে বাতিল করে দেবেন। ভারতের কাছে দেশকে বিক্রি করে দেবেন। ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি। এরূপ বক্তব্যে সৈন্যদের উত্তেজিত করা স্বাভাবিক। চতুর্থ কারণ– সৈন্যদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লোভনীয় নগদ অর্থ প্রদানসহ শাসন ক্ষমতা দখল করে প্রভাব-প্রতিপত্তি বণ্টন করা হবে।

মেজর রশীদ ওই ক্যুকে সামরিক অভ্যুত্থানে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিটকে সংশ্লিষ্ট করতে প্রচেষ্টা চালায়। রাত ১১টার পর মেজর ডালিম নূর, শাহরিয়ার, আজিজ পাশা ও বজলুল হুদাকে নিয়ে রশীদের কাছে এলো। এদেরসহ রশীদ ১২ ট্রাক সৈন্য নিয়ে ট্যাঙ্ক গ্যারেজে মেজর ফারুকের সঙ্গে যোগ দিল। এই অপারেশনের প্রধান মেজর ফারুক অন্য সহযোগীদের উদ্দেশে পরিকল্পনা পেশ করে, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পনা সেরে নিল। তারা ঐকমত্য পোষণ করল।

হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত খুনিদের পদবিভিত্তিক পরিচয়

১। লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, ২। লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ, ৩। লে. কর্নেল শরীফুল হক ডালিম, ৪। লে. কর্নেল আজিজ পাশা, ৫। মেজর মহিউদ্দিন. ৬। মেজর শাহরিয়ার, ৭। মেজর বজলুল হুদা, ৮। মেজর নূর, ৯। মেজর রশীদ চৌধুরী, ১০। মেজর শরীফুল হোসেন, ১১। ক্যাপ্টেন কিসমত হোসেন, ১২। লে. খায়রুজ্জামান, ১৩। লে. আবদুল মজিদ।

বঙ্গবন্ধুর বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা: বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে খুনিদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু যে কয়জনের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পেরেছিলেন, তাদের মধ্যে

সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ একজন। রেড ফোনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, কী ব্যাপার শফিউল্লাহ! তোমার আর্মি এখানে গোলাগুলি করছে! আর তুমি কী করছ? জবাবে সেনাপ্রধান বলেছিলেন: স্যার, আমি কিছু একটা করার চেষ্টা করছি। আপনি কি কোনোভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন? বঙ্গবন্ধু কোনো দিন, এমনকি ১৯৭১-এ ২৫শে মার্চ রাতেও পালিয়ে যাননি। ৩৫ হাজার সৈন্যের সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর উত্তর শুনে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, ও! তুইও ওদের সাথে আছিস!

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়

১। বঙ্গমাতা ফজিলাতুননেছা মুজিব (বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী), ২। শেখ কামাল (বঙ্গবন্ধুর বড়ো ছেলে), ৩। শেখ জামাল (২য় পুত্র), ৪। শেখ রাসেল (কনিষ্ঠ পুত্র), ৫। শেখ আবু নাসের (বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই), ৬। সুলতানা কামাল খুকু (শেখ কামালের স্ত্রী), ৭। পারভীন জামাল রোজী (শেখ জামালের স্ত্রী), ৮। আবদুর রব সেরনিয়াবাত (বঙ্গবন্ধুর সেজো বোনের স্বামী), ৯। শেখ ফজলুল হক মণি (বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে), ১০। বেগম আরজু মণি (শেখ ফজলুল হক মণির স্ত্রী), ১১। কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমদ (নিরাপত্তা অফিসার), ১২। বেবী সেরনিয়াবাত (আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছোট মেয়ে), ১৩। আরিফ সেরনিয়াবাত (আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কনিষ্ঠ পুত্র), ১৪। সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু (আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর ছেলে), ১৫। শহীদ সেরনিয়াবাত (আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভাইয়ের ছেলে), ১৬। আবদুল নঈম খান রিন্টু (আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই)।

স্তম্ভিত বিশ্ব: উচ্চভিলাসী সামরিক কর্মকর্তা ও ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের হত্যা করে গণতন্ত্র ও বাঙালির আশা- আকাঙ্ক্ষাকে চিরদিনের জন্য স্তম্ভিত করে দেয়। এ হত্যার সংবাদে বিশ্ব থর থর করে কেঁপে ওঠে। জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট স্মিথ ঘৃণাভরে ঘোষণা করেন, 'বাঙালি জাতিকে আর বিশ্বাস করা যায় না।' বিশ্ববিখ্যাত টাইমস ম্যাগাজিন কাভার স্টোরি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে– শেখ মুজিবকে যদি হত্যা করা হবে, তাহলে বাঙালি জাতির জন্মের প্রয়োজন ছিল না এবং তাদের জন্য নতুন কোনো দেশের অভ্যুদয় আবশ্যক ছিল না। 'ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তাৎক্ষণিক রাষ্ট্রদূত কেজি মুস্তাফাকে ডেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন, বিশ্ব একজন মুসলিম গ্রেড লিডারকে হারাল, যা পূরণ হওয়ার নয়।' সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল উইলসন এক বাঙালি সাংবাদিককে লিখেছিলেন, 'এটা তোমাদের জন্য একটা সর্বোচ্চ জাতীয় ট্র্যাজেডি। আমার জন্য গভীর মাত্রায় ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি।'

ষড়যন্ত্রকারীরা

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সব স্তর বা সব সৈন্য জড়িত ছিল না। জড়িত ছিল একটি ক্ষুদ্র অংশ। এ ক্ষুদ্র অংশটির পরিচয় পেতে একটুও সময় লাগেনি। যেহেতু তারা নিজেরাই বীরদর্পে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

খোন্দকার মুশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষীর নাম প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল খুনিদের সহযোগী হিসেবে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিদেশি শক্তি বিশেষ করে একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততা ছিল বলে ধারণা করা হয়।

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি

১. রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাদের ব্যর্থতার কারণ কী?
২. রাষ্ট্র ও সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ হত্যাকাণ্ডের খবর জানত কিনা?
৩. হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি কেন?
৪. রক্ষীবাহিনীর অবস্থান কী ছিল?
৫. হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত টাকার উৎস কোথায় ছিল?

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল: বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের হত্যার পর খুনিরা তড়িঘড়ি করে খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে দেখাতে চায় যে, বঙ্গবন্ধু জীবিত নেই বলে বাংলাদেশে কোনো প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে শূন্যতা সৃষ্টি হয়নি। উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন অথবা ভারতের মহাত্মা গান্ধী অথবা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান অথবা বার্মার জাতির জনক জেনারেল অং সংয়ের হত্যার পর খুনিরা এসব দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারেনি। কারণ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশের বিশ্বাসঘাতক সচিব ও জেনারেলরা যেভাবে খুনিদের পদলেহন করছিল, পায়ে চুমু খেয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেভাবে ওই দেশগুলোর সচিব-জেনারেলরা তা করেননি। বরং তৎক্ষণাৎ খুনিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিহত, নির্মূল করে সরকারকে অব্যাহত রেখেছিল।

উপসংহার

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না মর্মে সংবিধানে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে কালো আইন সংযুক্ত করা হয়। ফলে ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই পবিত্র সংবিধানটি হয় কালিমালিপ্ত। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সেই কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। হত্যাকারীদের কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। কয়েকজন হত্যাকারী এখনো বিদেশে পালিয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত রায় কার্যকর করা প্রয়োজন। এ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি শক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জাতির অধিকার আছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কারা ষড়যন্ত্র করেছে, তা জানার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের আজ দায়িত্ব হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলা। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করব– বাঙালি জাতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধু শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই, এটি সত্যি; কিন্তু তার চেয়ে বড়ো সত্য হলো বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে আছেন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ যেমন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র, ঠিক তেমনি বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরদিন থাকবেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। শেখ মুজিবের মৃত্যু নেই, মুজিব মৃত্যুঞ্জয়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি বাণী

১. আমার সবচেয়ে বড় শক্তি, আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।
২. সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।
৩. দেশ থেকে সব ধরনের অন্যায়-অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।
৪. এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত না খায়। স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার বাংলার মা-বোনরা কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।
৫. সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।
৬. সব সরকারি কর্মচারীদেরই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন।
৭. অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কোনোদিন এক সাথে হয়ে দেশের কাজে লাগতে নেই। তাতে দেশ সেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।
৮. গরিবদের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে।
৯. বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।
১০. বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই।

সূত্র: বঙ্গবন্ধুর বডিগার্ড আবদুস সালাম, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জয়শ্রী জামান, পিআইবি এদের লেখা বই ও প্রবন্ধ। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পত্রপত্রিকা।

লেখক : সাংবাদিক, শিক্ষক, গবেষক